শিক্ষাচিন্তায় সবুজ পরিসর
শিক্ষালোক একযুগ পূর্তি

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

এক জীবনে ফুল দিয়ে যাই
বাধাই নাকো সমর
হে দয়াময় মৃত্যু দিও
কিন্তু রেখো অমর

•

শাহজাহান ভুঁইয়া
২৮.০১.১৯৪৮ - ১৬.০৭.২০২৫

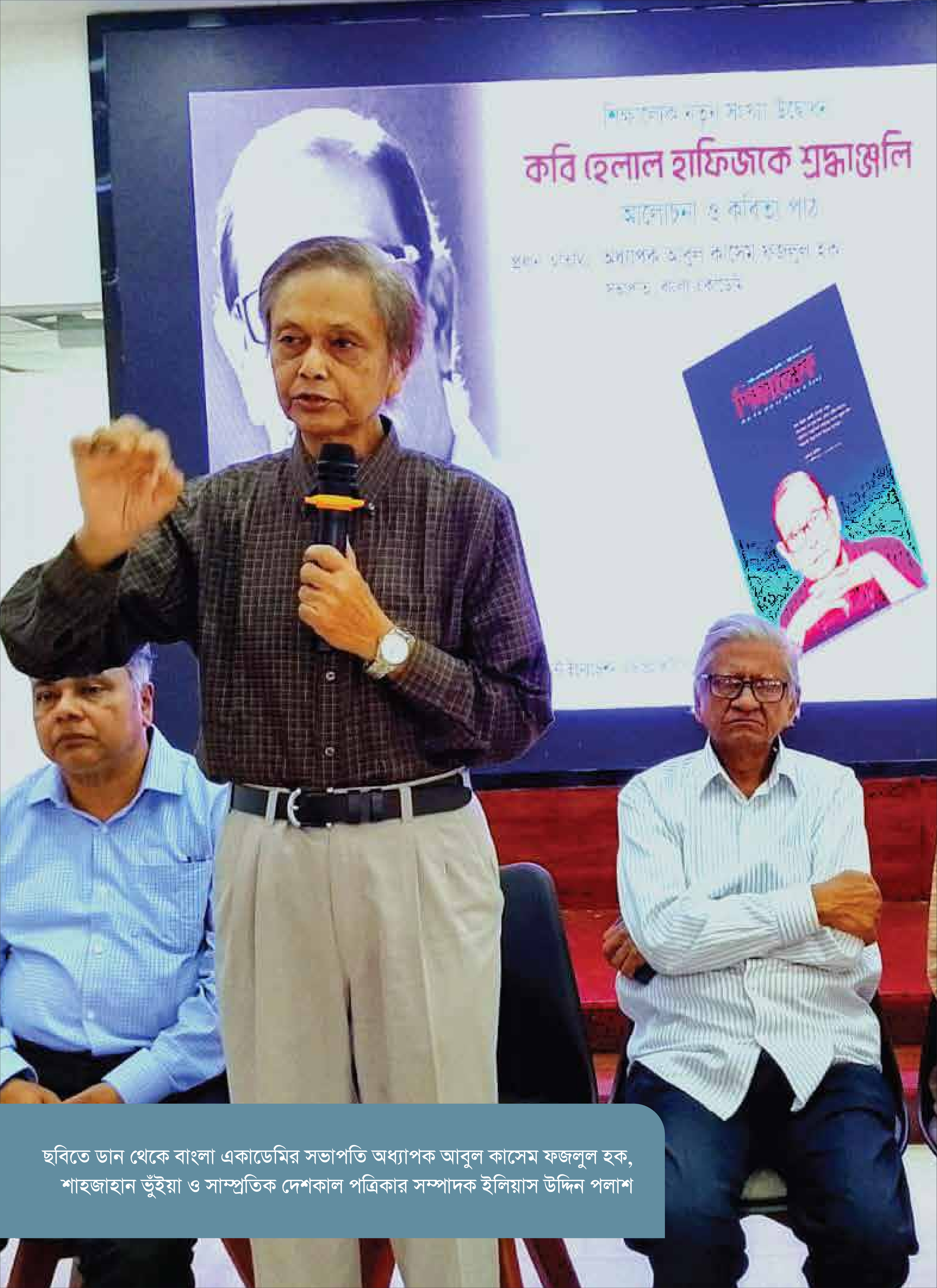

ছবিতে ডান থেকে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, শাহজাহান ভুঁইয়া ও সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকার সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
শিক্ষালোক
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● ১২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচি

শাহজাহান ভুঁইয়ার চিন্তা: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে
- আলমগীর খান ২

শাহজাহান ভাই স্মরণে - ফজলুল বারি ৭

একজন শাহজাহান ভুঁইয়া: যাকে সহজে ভুলা যায় না
- এম খায়রুল কবীর ৯

উন্নয়নকর্মে এক তাত্ত্বিক ও নৈতিক দিশারি
শাহজাহান ভুঁইয়া ১০

তিনি বক্তৃতা করবেন, সারসংকলন টানবেন পুরো আলোচনার - শিশির মল্লিক ১১

ওপারে ভাল থাকুন শাহজাহান ভাই - আবদুল হালিম খান ১২

প্রিয় শাহজাহান ভুঁইয়া স্যার - মো. জাহিদুল ইসলাম ১৩

শাহজাহান স্যারের সঙ্গে আমার ভ্রমণ - মাহবুব উল আলম ১৪

ইয়া মনির বই পড়ার গল্প - কাকলি খাতুন ১৭

গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা - শান্ত কুমার দাস ২০

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য - মো. শহিদুল ইসলাম ২১

সফলতার গল্প - মো. ইসরাফিল হোসেন ২৪

বই পর্যালোচনা - মোহাম্মদ আলী ২৬

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদ
এম জি হোসেন শিকদার

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি 🌐 irc.com.bd

সম্পাদকীয়

যাদের রক্তে প্রবাহিত হয় পিছিয়ে পড়া গণমানুষের জন্য উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম-উদ্দীপনা সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া তাঁদের একজন। সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মানুষটি বাস্তববাদী হয়েও বাস করতেন জ্ঞানের উচ্চতর জগতে। তাঁর আলোচনায় প্রায়শই আসতো পাওলো ফ্রেইরি, বার্ট্রান্ড রাসেল, অমর্ত্য সেনসহ অসংখ্য জ্ঞানীগুণী মানুষের প্রসঙ্গ। উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি, মানবসম্পদ, ব্যবস্থাপনাসহ জটিল বিষয়সমূহ খুব সহজ হয়ে যেত তাঁর উপস্থাপনায়। বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন তিনি। শাহজাহান ভুঁইয়াকে একজন উন্নয়ন দার্শনিকও বলা যায়।

আর শিক্ষালোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো প্রাণের। সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, শিক্ষালোক, মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার এসব ছিলো তাঁর কাছে অত্যন্ত গৌরবের, কারণ এগুলোকে তিনি মৌলিক কাজ বলতেন। সিদীপের নামের সঙ্গে যুক্ত 'ইনোভেশন' শব্দটিকে তিনি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখতেন। আর উপরোল্লিখিত কার্যক্রমগুলোকে তিনি উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সিদীপের অবদান মনে করতেন।

এই দার্শনিকতুল্য মানুষটি কর্ম-উদ্দীপনায় ছিলেন এক টগবগে তরুণের মত। গত ৩০শে জুন তিনি সভাপতিত্ব করেন ঢাকায় সংস্থার মিলনায়তনে আয়োজিত 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা' বই নিয়ে এক চমৎকার আলোচনা সভাটিতে। সিদীপের ও শিক্ষালোকের একটি বড় আয়োজনে এটিই তাঁর শেষ অংশগ্রহণ। এরপর ১৬ই জুলাই তিনি চলে গেলেন সবাইকে ছেড়ে।

শিক্ষালোকের চলতি সংখ্যাটি আমরা এই জ্ঞানপিপাসু উন্নয়নক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় মানুষটিকে নিবেদন করছি। যতদিন সিদীপ থাকবে শাহজাহান ভাই তাঁর চিন্তার ও কর্মের প্রভাব নিয়ে আমাদের মাঝে থাকবেন।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

শাহজাহান ভুঁইয়ার চিন্তা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে

আলমগীর খান

যে ব্যবস্থায় কয়েক ধরনের শিশু সবসময় শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায়, সেটি ত্রুটিপূর্ণ ও অন্যায়। সমস্যাটি ঐ ধরনের শিশুর নয়, শিক্ষাব্যবস্থার

কাউকে বাদ না দিয়ে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানার্জন

স্কুল-কলেজে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য শিশু-কিশোর প্রজন্মের মাঝে জ্ঞানের বিস্তার। যদিও নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সনদপত্র দেয়ার বিধান আছে, সনদপত্রটা মূল উদ্দেশ্য না। মূল উদ্দেশ্য প্রকৃত জ্ঞানের প্রসার। তবে স্কুল-কলেজ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়, তা হলো প্রকৃত জ্ঞানকে পিছনে ফেলে সনদপত্রের মুখ্য হয়ে ওঠা। ঝকঝকে ও চকচকে সনদপত্র প্রদান ও অর্জন হয়ে ওঠে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অনেকের ক্ষেত্রে ব্যবসাও। কিন্তু সনদপত্র সবসময় প্রকৃত জ্ঞানের প্রমাণ নয়। ভুয়া জ্ঞানের জন্যও সনদপত্র লাভ করে প্রকৃত জ্ঞানকে সরিয়ে দিয়ে সমাজে আধিপত্য লাভ করা যায়। যা কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

একটা কৌতুক প্রচলিত আছে আলবার্ট আইনস্টাইন ও তার গাড়ির চালককে নিয়ে। বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের সামনে তিনি যে আপেক্ষিক তত্ত্ব বর্ণনা করতেন তা শুনে শুনে তার গাড়িচালকেরও তা মুখস্থ হয়ে যায়। একদিন আইনস্টাইনের সম্মতিক্রমে তার গাড়িচালকই এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। কিন্তু যখন দর্শকদের মাঝ থেকে একজন বিজ্ঞানী তাকে একটি প্রশ্ন করেন, সে এর উত্তর না জানায় চালাকি করে বলে যে, এতো খুবই সহজ উত্তর যা আমার গাড়িচালকও জানে, আপনি বরং তাকেই জিজ্ঞেস করুন। গাড়িচালক বলতে তিনি বুঝিয়েছেন প্রকৃত আইনস্টাইনকে।

একই গল্প আবার পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও তার গাড়িচালককে নিয়েও প্রচলিত। দি আর্ট অব থিংকিং ক্লিয়ারলি বইতে রলফ ডোবেল এ কৌতুকটি উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা-গবেষক ও উন্নয়ন-চিন্তক শাহজাহান ভুঁইয়া তার অ্যান এডুকেশনাল অ্যাপ্রোচ টু ইনক্লুশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট বইতে (২০১৮র ডিসেম্বরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ কর্তৃক প্রকাশিত) এ গল্পটি পুনরুল্লেখ করেছেন প্রকৃত জ্ঞানের সঙ্গে কৃত্রিম জ্ঞানের পার্থক্য বোঝাতে। প্রকৃত জ্ঞান গল্পের গাড়িচালকের জ্ঞান থেকে, তোতাপাখির মুখস্থ আউড়ানোর ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখক ভুঁইয়ার মতে 'প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষার্থীর মনকে আলোকিত করে যারা অন্যদের মনকেও একইরকমে আলোকিত করতে সক্ষম এবং যা মানুষকে আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে সক্ষম করে তোলে যা এই গ্রহে মানবতা বেঁচে থাকতে অপরিহার্য।'

> স্কুল-কলেজ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়, তা হলো প্রকৃত জ্ঞানকে পিছনে ফেলে সনদপত্রের মুখ্য হয়ে ওঠা। ঝকঝকে ও চকচকে সনদপত্র প্রদান ও অর্জন হয়ে ওঠে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এই লক্ষ্যে তৈরি হতে হবে। মূল উদ্দেশ্য হতে হবে জ্ঞানবিস্তার যা শিক্ষার্থীর মনকে এমনভাবে আলোকিত করবে যে তারাও অন্যদেরকে আলোকিত করতে পারবে এবং তারা আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকর্মে সক্ষম হয়ে উঠবে। যা মানবতার টিকে থাকা ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু শিক্ষা যদি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত না হয়, প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব হবে না।

প্রথমত অন্তর্ভুক্তির কথা ধরা যাক। যার অর্থ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সমাজের কোনো শিশু কোনো অজুহাতেই বাদ যাবে না। যে শিক্ষাব্যবস্থা বিত্ত, পেশা ও বংশের ভিত্তিতে সমাজের কিছু শিশুকে শিক্ষা দেয়, কিন্তু পারিবারিক জাতি-বর্ণ-পেশার পরিচয়, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ও সর্বোপরি দারিদ্র্যের কারণে বহু শিশুকে শিক্ষার বাইরে রাখে তা নিঃসন্দেহে দোষী। অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় কয়েক ধরনের শিশু সবসময় শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায়, সেটি ত্রুটিপূর্ণ ও অন্যায়। সমস্যাটি ঐ ধরনের শিশুর নয়, শিক্ষাব্যবস্থার। যেখানে প্রত্যেকে সমানভাবে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায় না, সেখানে প্রকৃত জ্ঞানচর্চা সম্ভব না। অতএব এমন ব্যবস্থা তৈরি হওয়া প্রয়োজন যেখানে কোনো শিশু কোনো অজুহাতেই বাদ না পড়ে। তবেই শিশুর প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হবে। না হয়, প্রতারণা হবে যারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে ও যারা বাদ পড়ছে উভয়ের সঙ্গে।

এরপর মানসম্মত শিক্ষার প্রশ্ন। পণ্যের ক্ষেত্রে মানসম্মত

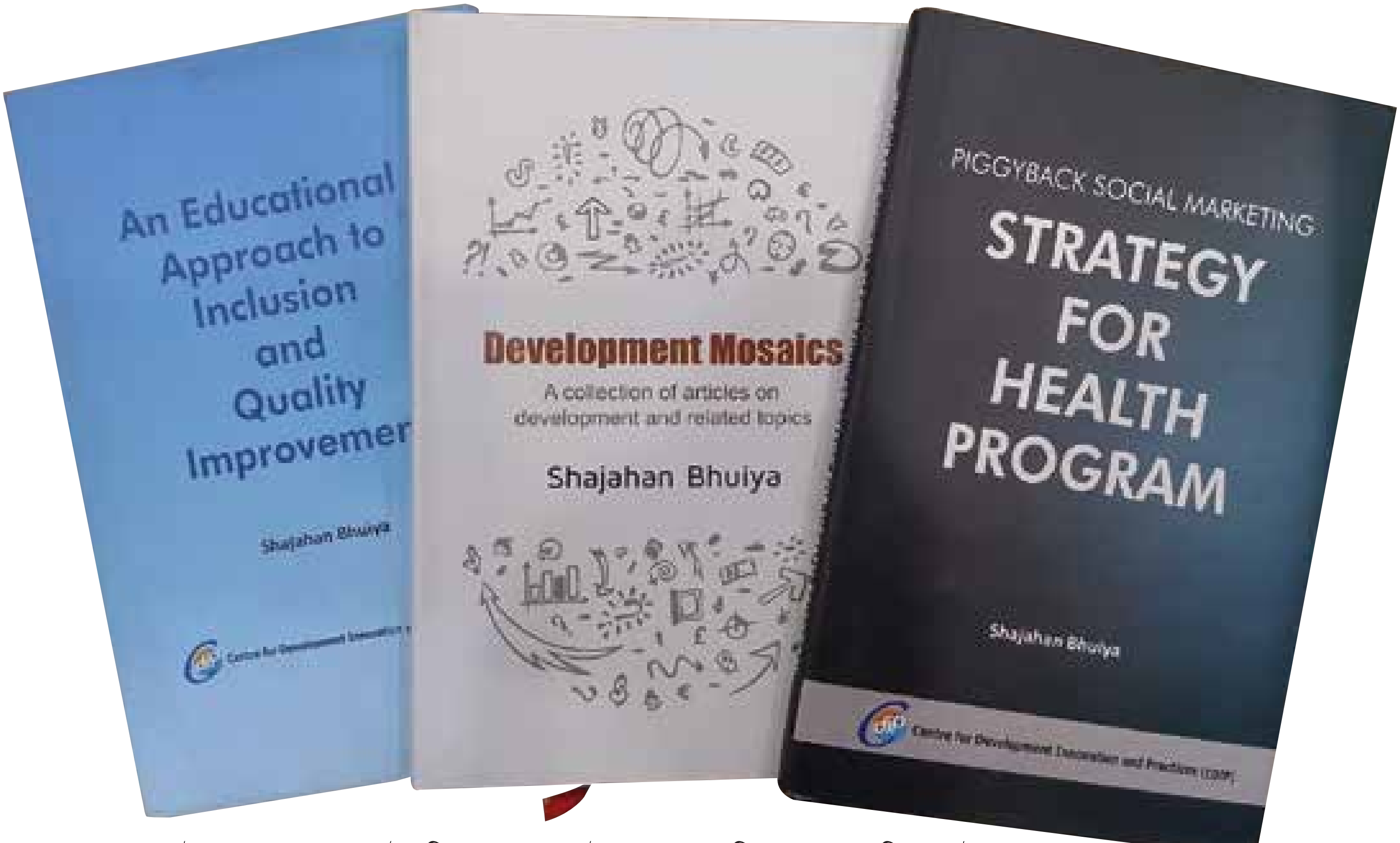

কথাটা যত ভালভাবে খাটে, শিক্ষার সঙ্গে ততটা নয়। কারণ শিক্ষা তো সবসময় মানসম্মতই হতে হবে। গুণমান বাদ দিলে শিক্ষা কথাটার আর কোনো মানেই থাকে না। জ্ঞান প্রকৃতই হবে, অপ্রকৃত বা ভুয়া জ্ঞান বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এখন শিক্ষার আগে এই বাড়তি মানসম্মত কথাটা জুড়ে দিতে হচ্ছে, কেননা শিক্ষা ও জ্ঞান বলে বাজারে অনেক কিছু চালু আছে ও আধিপত্য বিস্তার করেছে যা অপ্রকৃতই শুধু নয়, ক্ষতিকরও। অতএব, শিক্ষায় মানের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়ের সুযোগ নেই।

শাহজাহান ভুঁইয়া তার বইতে প্রকৃত শিক্ষার জন্য এই অন্তর্ভুক্তির ও মানের দিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানসম্মত শিক্ষার জন্য 'জগ ও মগ' শিখন পদ্ধতি অনেক আগেই অচল হয়ে গেছে। বলেছেন, 'শিশু নিষ্প্রাণ সত্ত্বা নয় যে, তাকে নির্দেশিত জ্ঞান, দক্ষতা বা অভ্যাস দিয়ে ভরাট করা যাবে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে সম্পর্ক হতে হবে এক প্রাণের সঙ্গে আরেক প্রাণের, সপ্রাণের ও নিষ্প্রাণের নয়। সম্পর্কটা মানুষে মানুষে, মানুষে ও বস্তুতে নয়। জ্ঞান জগ থেকে মগে ঢেলে দেয়ার জিনিস নয়।'

জগ ও মগের শিখন পদ্ধতিতে কেবল গল্পে আইনস্টাইনের বা ম্যাক্স পাংকের গাড়িচালক তৈরি হতে পারে যিনি কেবল না বুঝেই মুখস্থ আউড়ে যেতে পারেন। অন্যদিকে প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। আধুনিক দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির যুগে যা সবচেয়ে প্রয়োজন। অতএব শিখন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার– দাতা ও গ্রহীতার নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে এর একটা চমৎকার ছবি এঁকেছেন: 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়। কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়– এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো-একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়। কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।'

অতএব শিক্ষা কলেছাঁটা জিনিসের মতো করে শিক্ষকরূপী জগ হতে শিক্ষার্থীরূপী মগে ঢেলে দেয়া যায় না। শিক্ষক ও

শিক্ষার্থী উভয়কে প্রাণময় হতে হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও শিখন পদ্ধতি এই প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক হতে হবে। এজন্য ভীতি, শাস্তি, অপমান, ব্যর্থতার গ্লানি, আনন্দহীনতা ইত্যাদি বিষাক্ত দ্রব্য এই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ দূর হতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ ও শিখন প্রক্রিয়া হতে হবে প্রত্যেক শিশুর জন্য আনন্দদায়ক ও সৃষ্টিশীল। তবেই কেউ বাদ পড়বে না ও মানসম্মত প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব হবে। হবে প্রকৃত জ্ঞানার্জন।

তৃণমূলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার অভিনব কৌশল

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামের সব সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও চিকিৎসাব্যবস্থার কর্মকর্তাদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে সব সাধারণ মানুষ সে ব্যবস্থার সুফল একইভাবে নিতে পারছে না। হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানসিক ব্যবধান রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষার ফলেও চিকিৎসা ব্যবস্থার সুফল সবাই সমানভাবে পায় না। সবচেয়ে বঞ্চিত হয় নিরক্ষর দরিদ্র

> যেকোন সেবা তৃণমূলে পৌঁছে দেয়ার একটি ব্যবস্থাপনা খরচ বা ম্যানেজমেন্ট কস্ট আছে, যা সাধারণত বেশ বড়ই হয়। মানে খাজনার চেয়ে বাজনা খরচই অনেক সময় বেশি হয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রকল্পের বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটে। তবে যদি একটি মূল প্রকল্পের কাঁধে উঠিয়ে কিছু আনুষঙ্গিক সেবা-প্রকল্প চালানো যায়, তা কম ব্যয়ে সম্ভব। সেক্ষেত্রে উন্নয়ন বা সেবা-প্রকল্প টেকসই হতে পারে

মানুষ। এ সংকটের মধ্য দিয়েই প্রাইভেট ক্লিনিক ও চিকিৎসাব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন যার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবার সেই অসহায় নিরক্ষর দরিদ্র মানুষ। এ ধরনের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে তার দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া ও সেইসঙ্গে রোগপ্রতিরোধমূলক চিকিৎসাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসচেতনতা। তবে এই প্রয়োজনটি বোঝা যত সহজ, এটি বাস্তবায়নের সঠিক কৌশল নির্ণয় করে তা অবলম্বন করা তারচেয়ে অনেক কঠিন।

যেকোন সেবা তৃণমূলে পৌঁছে দেয়ার একটি ব্যবস্থাপনা খরচ বা ম্যানেজমেন্ট কস্ট আছে, যা সাধারণত বেশ বড়ই হয়। মানে খাজনার চেয়ে বাজনা খরচই অনেক সময় বেশি হয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রকল্পের বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটে। তবে যদি একটি মূল প্রকল্পের কাঁধে উঠিয়ে কিছু আনুষঙ্গিক সেবা-প্রকল্প চালানো যায়, তা কম ব্যয়ে সম্ভব। সেক্ষেত্রে উন্নয়ন বা সেবা-প্রকল্প টেকসই হতে পারে। তৃণমূল পর্যায়ে এনজিওদের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক আছে। এই নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে কিছু সেবা প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। অর্থাৎ একটি কার্যক্রমের ঘাড়ে চড়ে আরো কিছু সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব উল্লেখযোগ্য বাড়তি খরচ ছাড়াই। সহজ করে বললে, ধরা যাক ঢাকা থেকে কোনো গাড়ি যাত্রী নিয়ে নিয়মিত কোনো একটি প্রত্যন্ত এলাকায় যায়। বাড়তি খরচ ছাড়াই ঐ গাড়িতে কিছু জরুরি ঔষধপত্র বা শিক্ষা-উপকরণ উক্ত প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়মিত পৌঁছে দেয়া সম্ভব। এ হলো কারো ঘাড়ে চড়ে বা পিগিব্যাক কৌশলে যাওয়া। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামপর্যায়ে দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সিদীপ এরূপ একটি কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে ও তা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করছে।

সিদীপের এ উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়তা পেয়েছে ও এরফলে স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যাও দিনদিন বাড়ছে। ২০১৩ সাল থেকে এ কর্মসূচি চললেও এটি শুরু করতে গিয়ে সংস্থাকে হোঁচট খেতে হয়েছে। এ কর্মসূচির জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের পূর্ব পর্যন্ত এটি সফল হয়ে ওঠেনি। দরিদ্র মানুষের কাছে স্বল্প খরচে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার প্রবল ইচ্ছার কারণে সংস্থা সঠিক কর্মকৌশল উদ্ভাবনে ও কর্মসূচি প্রচলনে সক্ষম হয়, যার ফলে বর্তমানে এটি একটি স্বনির্ভর কর্মসূচি, অর্থাৎ এমন একটি বড় আয়তনের কর্মসূচি যেখানে ব্যয়কে আয় থেকে নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রান্তিক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণের জন্য গৃহীত অনেক সামাজিক কর্মসূচি এরকম প্রাথমিক সংকটের মুখে পড়তে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতার

মধ্য দিয়ে সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারিত হয়। সিদীপের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির বেলায়ও তাই ঘটেছে এবং সঠিক কৌশল খুঁজে পাওয়ার ফলে বর্তমানে এটি সংস্থার লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যাপক মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করতে পেরেছে।

প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কুটি ও ধরখারে শুরু হয়ে

বর্তমানে এ স্বাস্থ্য কর্মসূচিটি গ্রাম পর্যায়ে সংস্থার ৭৭টি শাখা কার্যালয়ে চালু রয়েছে। (বইয়ে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বেশি) উদ্দেশ্য, দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া এবং সুস্থ-সবল জনগোষ্ঠি তৈরিতে ভূমিকা রাখা। সংস্থাটির কর্ম-এলাকাগুলোয় একজন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) প্রতিদিন সকালে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে মোবাইল ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে এবং দুপুরের পরে সংস্থার স্থানীয় অফিসের নিজস্ব চেম্বারে অবস্থান করে সর্বসাধারণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। পাশাপাশি উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে সুবিধাজনক স্থানে মাসে ১/২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যক্যাম্প করা হয়

সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির এই সঠিক কর্মকৌশল ও পদ্ধতি কী এবং কীভাবে এই কর্মসূচিকে আরো সফল ও টেকসই করার মাধ্যমে আরো ব্যাপক সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া যায় তা অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজন অনুভব হয়। এ প্রয়োজন থেকে বিষয়টি নিয়ে একটি কোয়ালিটেটিভ গবেষণা পরিচালনা করেন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ শাহজাহান ভূঁইয়া। Piggyback Social Marketing Strategy for Health Program শীর্ষক এ গবেষণা প্রতিবেদনটি সিদীপ এ বছর (২০১৮) মার্চে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে।

কর্মসূচিটিতে সংস্থার কোনো ঋণগ্রহীতা সদস্য বার্ষিক ২০০ টাকা মূল্যের বিনিময়ে একটি স্বাস্থ্যকার্ড ক্রয় করতে পারেন। এই কার্ড থাকলে উক্ত সদস্যের পুরো পরিবার সংস্থার নিয়োগপ্রাপ্ত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের কাছ থেকে সারা বছর চিকিৎসাসেবা নিতে পারে। গড়ে কোনো পরিবারের মোট সদস্য পাঁচ জন হলে প্রতিদিন খরচ হবে প্রত্যেকের জন্য দিনে মাত্র ১১ পয়সা। অবশ্য রক্ত পরীক্ষা, গর্ভধারণ পরীক্ষা, রক্তে শর্করার মাত্রা নির্ণয়, রে থেরাপি, নেবুলাইজেশন ইত্যাদির জন্য বাড়তি টাকা দিতে হয়। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে যখন কোনো ক্যাম্প করে চিকিৎসা করা হয়, তখন সদস্যরা বিনা খরচে ও অন্যরা কিছু অর্থের বিনিময়ে এই সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

গবেষক তার গভীর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দীর্ঘ উন্নয়ন-অভিজ্ঞতার আলোকে এ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিটির বিশেষত্ব এবং শক্তি ও দুর্বলতার দিকসমূহ তুলে ধরেছেন। McKinsy's 7S Model, "Core Design" School Model of Strategy Formation I 4Ps of Marketing Mix – এই ৩টি ধারণা-কাঠামোর আলোকে তিনি সিদীপের স্বাস্থ্য কর্মসূচির বিচার-বিশ্লেষণ করে এর প্রায়োগিকতা নির্ণয় করেছেন। কর্মসূচিটিকে আরো দরিদ্রবান্ধব ও টেকসই করার জন্য এ প্রতিবেদনটি উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করবে।

গবেষক তার গভীর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দীর্ঘ উন্নয়ন-অভিজ্ঞতার আলোকে এ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিটির বিশেষত্ব এবং শক্তি ও দুর্বলতার দিকসমূহ তুলে ধরেছেন।

এ কর্মসূচির সাফল্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দিক এর স্বল্প খরচ ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সরাসরি মানুষের দোরগোড়ায় যাওয়া। কিন্তু তা যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ গ্রাম পর্যায়ে সংস্থাটির শাখা কার্যালয়। কর্মসূচিতে নিয়োজিত SACMO এ শাখা কার্যালয়ে অবস্থান করে চিকিৎসাসেবাটি দিয়ে থাকেন। একেবারে দরিদ্র মানুষের কাছে থাকা ও যাওয়ার জন্য এটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। আবার সংস্থার মূল কার্যক্রম ক্ষুদ্রঋণের পাশে থেকে একই এলাকায় প্রায় একই মানুষের মাঝে এ সেবাকার্যটি চালানোর জন্য কর্মসূচিতে কোনো বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে না। মূল কার্যক্রমের নেটওয়ার্ক ও শক্তির ওপর ভর করে এটি চলতে পারছে। এগুলো হচ্ছে এই কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য ও সাফল্যের কারণ।

অন্যান্য সংস্থাও এধরনের কর্মকৌশল অবলম্বন করে দেখতে পারে। যাতে স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন সেবা সহজে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। (*পুনর্মুদ্রিত*)

শাহজাহান ভাই স্মরণে

ফজলুল বারি

শাহজাহান ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় পরিণত বয়সে। যতদূর মনে পরে ইয়াহিয়ার অফিসে উনার সাথে আমার প্রথম দেখা। তিনি তখন সিদীপের 'স্বাস্থ্য কর্মসূচী' এবং 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচীর' উপর গবেষণার কাজ শেষ করে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের কাজ নিয়ে ব্যাস্ত ছিলেন। আমি তখন সিদীপের একটি কাজে পরামর্শক হিসাবে সবেমাত্র যোগ দিয়েছি। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ও পরিচয়। জানতে পারলাম, শাহজাহান ভাই আশির দশকে ইয়াহিয়ার সাথে প্রশিকার মানিকগঞ্জে অবস্থিত কড্ডার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একসঙ্গে ট্রেনিং করছিলেন। পরে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইয়াহিয়া যখন সিদীপ প্রতিষ্ঠা করেন, প্রায় তখন থেকেই শাহজাহান ভাই সিদীপের সাথে যুক্ত হয়ে যান। শুধু যুক্ত হয়েই যান না, আমৃত্যু তিনি সিদীপের একজন একনিষ্ঠ ও গুণমুগ্ধ সমর্থক ছিলেন।

২০১৭ ও ২০১৮ সালে দুই বছর আমি সিদীপে পরামর্শক হিসাবে কাজ করি। সে সময় আমাকে সপ্তাহে একদিন করে সিদীপ অফিসে যেতে হত। তখন শাহজাহান ভাইয়ের সাথে আমার প্রায় প্রতিনিয়িতই দেখা হত। তিনি শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খানের পাশে বসে নিবিড়ভাবে লিখে যেতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার বেশির ভাগ দেখা হত, ইয়াহিয়ার অফিস কক্ষে। নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা হত। আমার উপস্থিতির কারণে, কোন কোন সময় আলাপের বিষয়বস্তু হয়ে উঠত কুমিল্লা একাডেমীর কাজ নিয়ে, আখতার হামিদ খানের প্রসঙ্গ নিয়ে। তৃণমূল পর্যায়ে একাডেমীর কাজ, প্রশিকার কাজ এবং সিদীপের কাজকর্মের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক সময়ই আড্ডা জমে উঠত। একাডেমীর কাজকর্ম সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল প্রচুর। সিদীপে তাঁর গবেষনার বিষয়বস্তু এবং কাজকর্ম নিয়েও দীর্ঘ আলাপ হত। সে সময় শাহজাহান ভাই একজন পুরোদস্তর গবেষক-লেখক। তাঁর লেখা মোট ৭টি বইয়ের মধ্যে ২টি বই প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৮ সালে। বই দুইটি ছিল সিদীপের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচীর উপর গবেষণা ও মূল্যায়ন গ্রন্থ। সে সময় প্রকাশের আগে বই দু'টির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হত সিদীপ অফিসে। সে সময় আমি লক্ষ্য করতাম সিদীপের কাজকর্মের প্রতি তাঁর কেমন যেন একটা বিশেষ আকর্ষণ ও অনুভূতি ছিল। বই দুটি ছাড়াও সিদীপের বিভিন্ন কাজকর্মের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ, সেমিনার আর্টিকেল তিনি লিখে গেছেন যা বিভিন্ন দেশি ও বিদেশী পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

সিদীপে আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমার যাতায়াত কমে যায়। তারপরও মাঝে মাঝে যেতাম। কারন ইয়াহিয়া আমার ছোট ভাই, তাছাড়া শিক্ষালোকে কিছু লেখালেখি করতাম। তখন দেখা হতো শাহজাহান ভাইয়ের সাথে। তিনি প্রধানত ইংরেজি ভাষায় লিখতেন। তাঁর অধিকাংশ লেখাই ইংরেজিতে। কিন্তু বাংলাতেও তিনি সমভাবে দক্ষ ছিলেন। তাঁর বাংলা একটি কবিতার বই 'স্বপ্নের পাখীরা' প্রকাশিত হয়েছিল ২০১১ সালে। তিনি যখন সিদীপ অফিসে আলমগীর খানের পাশে বসে কাজ করতেন তখন শিক্ষালোকে প্রকাশিতব্য প্রায় সব লেখা তিনি নিজ থেকে পড়তেন এবং পরামর্শ দিতেন। এটি আলমগীরও স্বীকার করবেন। প্রসঙ্গত আমার একটি লেখার কথা বলি। আমি ১৯৭৪ সালে তখনকার পূর্ব জার্মানি ভ্রমণে গিয়ে বার্লিন বিমানবন্দর থেকে বেড়িয়ে বাসে চড়ে বার্লিনের ব্যাস্ত রেলওয়ে স্টেশন থেকে নির্দিষ্ট রেললাইনের ট্রেনে উঠে যাত্রা পথের মাঝখানে নেমে লাইন বদল করে অন্য লাইনে ট্রেন উঠে 'লাইপজিগ' স্টেশনে যেতে হয়েছিল কোন 'গাইড' ছাড়া এবং সে দেশের ভাষা না জানায় কারও সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও। কিভাবে গেলাম, এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে তখনকার পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির ইতিহাস লিখেছিলাম অনেকগুলি 'ফুটনোট' সহকারে। শাজাহান ভাই এর খসড়াটি পড়েছিলেন যখন আলমগীর লেখাটির সম্পাদনা করছিলেন। তিনি পড়ে মন্তব্য করেছিলেন লেখাটির বক্তব্য আর জার্মানির ইতিহাস একই প্রবন্ধে নিয়ে এসে লেখাটির আমেজকে অনেকটাই নষ্ট করে দিয়েছে। পরামর্শ দিলেন সকল ফুটনোট আর ইতিহাস বাদ দিন। এগুলি ছাড়াই লেখাটি অনেক আকর্ষণীয়। তাই করেছিলাম। এমনিতরো পরামর্শ তিনি স্বেচ্ছায় দিতেন শিক্ষালোকের অনেক লেখাতেই। এভাবেই

শাহজাহান ভাই হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষালোকের পরোক্ষ ও পর্দার আড়ালের একজন পরামর্শক।

শাহজাহান ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক গভীর হয় ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর যখন আমি ও শাহজাহান ভাই সিদীপের গভর্নিং বডিতে একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করি ২০২০ সালে। তখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হয়, তাঁর কাজের মাধ্যমে তাঁকে আরও নিবিড়ভাবে চেনার সুযোগ হয়। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যে কোন বিষয়ে আমি প্রথম ব্যক্তি হিসাবে পরামর্শ করতাম শাহজাহান ভাইয়ের সাথে। সিদীপের সকল কর্মকাণ্ডে আমি তাঁকে পাই একজন বিশ্বস্ত, নিবেদিত, সিদীপ সম্পর্কে গভীরভাবে জ্ঞাত একজন সত্যিকার বন্ধুরূপে। পরিচালনা পর্ষদের সভায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচনায়, নানা ধরনের দিবস উদযাপনে তিনি যে বক্তব্য রাখতেন তাতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বুঝা যেত। সিদীপ বিষয়ক যে কোন আলোচনায় তাঁর সুপরামর্শ আমার মনে এই ধারণার সৃষ্টি করত যে তিনি সিদীপ সম্পর্কে ভাল জানতেন এবং এর কাজকর্মের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। বিশেষ করে এর প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার সকল ধারণা, তাঁর সকল প্রচেষ্টাকে তিনি অভিনব বলে ভাবতেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি প্রায়শই তা' উল্লেখ করতেন।

শাহজাহান ভাই ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ। তিনি একাধারে একজন লেখক, গবেষক, শিক্ষক ও সমাজ কর্মী ছিলেন। এ সকল গুণ তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর গভীর পড়াশুনা এবং গ্রাম-গঞ্জের মানুষের সাথে মেলামেশার কারণে। বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিদের তাত্ত্বিক লেখা তিনি সহজেই আয়ত্ত করতে পারতেন এবং সেগুলি তাঁর বিভিন্ন গবেষণায় ও বক্তিতায় ব্যবহার করতেন অত্যন্ত সাবলিল ভাবে। তাঁর চাইতেও বড় কথা তিনি যখন তৃণমূল পর্যায়ে কোন কিছু পর্যবেক্ষণ করতেন তখন তা অতি সহজেই তাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে সমন্বয় করে বিশ্লেষণ করতে পারতেন। এটি তাঁর একটি বিরল প্রতিভা ছিল যা' খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁর লেখার এই বৈশিষ্ট্যের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম যখন শাহজাহান ভাই ২০২২ সালে প্রকাশিত তাঁর Development Mosaics বইটির একটি ভূমিকা লিখে দিতে বলেছিলেন। তাঁর এই বিরল গুণের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম এইভাবে, he possesses the unique quality of keen observation and critical analysis of grass-roots level activities performed by various development organizations, especially the NGOs for development of the rural poor and explaining them in a manner to theorize them or put them in a theoretical framework to be more logical and acceptable by the readers and users. This uncommon characteristic of his writings always attracts me to read his books with eagerness and enthusiasm.

শাহজাহান ভাই একজন সদালাপী ও অমায়িক মানুষ ছিলেন।

শাহজাহান ভুঁইয়ার ডানে লেখক

তিনি খুব সহজেই বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষদের সাথে মিশতে পারতেন। উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞানীগুণী অনেক মানুষের সাথে তাঁর সখ্যতা ছিল। তাঁর সাথে গল্প করতে বসলে অনেক কিছু জানা যেত। সিদীপ কার্যক্রম মূল্যায়নকালে গবেষণা টিমকে তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। শাহজাহান ভাই ভ্রমণ করতে খুব ভালো বাসতেন। তিনি নিজেই একদিন আমাকে বলেছেন, ইয়াহিয়া যখনই প্রকল্প এলাকায় যেতেন তখন বেশিরভাগ সময়েই তিনি তাঁর সঙ্গি হতেন। ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর তিনি এটি খুব 'মিস' করতেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ছোটবেলার একজন বন্ধু, যিনি ময়মনসিংহে থাকেন, তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। একদিন আমি উনাকে ফোন করে জানতে চাইলাম, তিনি কোথায়। তিনি বললেন, তিনি বাসে আখাউড়া থেকে ঢাকায় ফিরছেন। ব্যাপার কি জানতে চাইলে তিনি বললেন, তাঁর সেই বন্ধুকে নিয়ে তিনি আসাম রাজ্যের কামরূপ-কামাখ্যা দেখে দেশে ফিরছেন। তখন তাঁর শরীরের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। কিছুদিন আগে তিনি ভারত থেকে হার্টের ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। তারপর থেকে অবশ্য তিনি ভালোই ছিলেন। সিদীপের সকল কর্মসূচিতেই নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। এটাও একটা বড়ও গুণ ছিল উনার। যখনই যেখানে ডাক পেতেন, না করতেন না। চলে আসতেন, অসুস্থ শরীর নিয়েও। কথা হত আমার সাথে সব বিষয়, সব মিটিং সম্পর্কে। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন কথা হত আমার সাথে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বলেছিলেন তাঁর কিডনির সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমাদের গভর্নিং বডির সদস্য পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিমের চেম্বারে যেতে চেয়েছিলেন। ফাহমিদা খবর পেয়ে নিজেই চলে এসেছিলেন সিদীপ অফিসে যার কাছেই ছিল উনার বাসা। চিকিৎসার সকল কাগজপত্র দেখে একটি 'ডায়েট চার্ট করে দিয়েছিলেন। আমি উপস্থিত ছিলাম। তার বেশ কিছুদিন পর একদিন বললেন, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আমি বললাম, ডাক্তারের কাছে কি গিয়েছিলেন। বললেন, হ্যাঁ। অনেক টেস্ট করতে দিয়েছে, আগামীকাল যাব। সেই টেস্ট করতেই গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে যে তিনি আর ফিরে আসবেন না এবং চিরতরে চলে যাবেন তা কে ভাবতে পেরেছিল? এভাবেই সকলকে অবাক করে দিয়ে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গেলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে সেখানে আমার আব্বা-আম্মাও শুয়ে আছেন চির নিদ্রায়। মহান আল্লাহ তায়ালা সকল কবরবাসীর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। আমীন।

লেখক: সম্পাদক, শিক্ষালোক

একজন শাহজাহান ভুঁইয়া: যাকে সহজে ভুলা যায় না

এম খায়রুল কবীর

আমার বন্ধু সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া যখন আমাকে সিদীপের সাধারণ পরিষদের সদস্য হবার অনুরোধ করেছিল তখন ওকে না করতে পারিনি। ফলে সিদীপের সাথে আমার সম্পর্কের সৃষ্টি হলো তখন থেকেই। সিদীপের পরিচালনা পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে আমার আস্তে আস্তে পরিচয় হতে থাকে। কয়েকজনের সাথে আমার পূর্ব পরিচয় থাকলেও পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়ার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় সিদীপের কোনো এক বার্ষিক সাধারণ সভায়। তিনি আমাকে অল্প সময়ের মধ্যেই আপন করে নিলেন। আমি যেহেতু বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লাতে কাজের সুবাদে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর একনাগাড়ে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি ফলে এ দিকটাই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছিল। পরে বুঝতে পেরেছি শাহজাহান ভাই গবেষণার প্রতি কতটা আগ্রহী ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে কতটা সময় তিনি দিয়েছেন।

এরপর যতবারই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে তা সেই সাধারণ সভাকেন্দ্রিকই ছিল। অথচ আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে এ যেন কত যুগের পরিচয়। সাধারণ সভার আগে-পরে, এমন কী সভা চলাকালীনও আমাদের মতবিনিময় চলতো। একজন মেধা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব শাহজাহান ভাই, আমাদের প্রিয় সহকর্মী এবং বন্ধুকে আমরা হারালাম। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যু আমাদের জীবনে– ব্যক্তিগত এবং পেশাগতভাবে এক শূন্যতা তৈরি করলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার দৃষ্টিতে শাহজাহান ভাই কেবল একজন গবেষকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন পরোপকারী, রসবোধসম্পন্ন, নম্র-স্বভাবের একজন ব্যক্তি, যিনি সবসময় সবার সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচার-আচরণ এবং শ্রদ্ধাবোধের চর্চা করতেন। তাঁর ভদ্র আচরণ এবং মানুষের মূল্যবোধের স্বীকৃতি দেবার দক্ষতা তাঁকে আমাদের অনেকের কাছে একজন প্রকৃত বন্ধু করে তুলেছিল।

আমার কাছে মনে হয়েছে, শাহজাহান ভাইয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি সিদীপের সকলের সাথে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, এমনকি যেসব গ্রামে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন, সেখানেও অনায়াসে মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তৃণমূল স্তরে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল। একজন গবেষক হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট, সমস্যা গভীরভাবে কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন সব সময়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে এই গভীর সংযোগ তাঁর কাজকে যেমন দিয়েছিল এক অনন্য শক্তি, ঠিক তেমনি করে তুলেছিল অর্থময়।

শাহজাহান ভুঁইয়ার পাশে লেখক, ডান থেকে তৃতীয়

পরিশেষে বলবো, আমরা শাহজাহান ভাইকে একজন নিবেদিতপ্রাণ উন্নয়নকর্মী, গবেষক, সমানুভূতিশীল বন্ধু এবং প্রজ্ঞা ও নম্রতার সমন্বয়ে দারুণভাবে প্রজ্জ্বলিত একজন ব্যক্তি হিসেবে এবং সর্বোপরি একজন চমৎকার মানুষ হিসেবে স্মরণ করব। তাঁর সাথে সরাসরি কাজ করার সম্মান অর্জনকারী সকলের জন্য তিনি রোল মডেল হয়ে থাকবেন। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক, এবং তাঁর পেশাদারিত্ব ও কাজের প্রতি নিষ্ঠার উত্তরাধিকার আমাদের মাঝে বেঁচে থাকুক।

লেখক: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর সাবেক মহাপরিচালক এবং সিদীপের সাধারণ পরিষদের একজন সদস্য

উন্নয়নকর্মে এক তাত্ত্বিক ও নৈতিক দিশারি শাহজাহান ভুঁইয়া

শাহজাহান ভুঁইয়া ছিলেন একজন লেখক, গবেষক ও উন্নয়নচিন্তক। তবে এরচেয়েও বড় পরিচয় তিনি ছিলেন এক চির জ্ঞানপিপাসু। অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে দুনিয়ার কোনো প্রান্তে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখা হলে ও তা ইংরেজিতে পাওয়া গেলে সেটা পড়ার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। আর তা নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁর কাছের লোকজনের সঙ্গে। সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া বছর পাঁচ আগে ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে তাঁর সেই সবচেয়ে কাছের লোকটি ছিলাম আমি। মনের ভিতর কোনো ভাবনার আলোড়ন উঠলেই হয় চলে আসতেন, না হয় ফোন দিতেন। কার্ল মার্কস, বার্ট্রান্ড রাসেল, অ্যালভিন টফলার, আর্নেস্ট এফ. শুমেকার থেকে সাম্প্রতিক সময়ের ইউভাল নোয়া হারারি, কেট রওয়ার্থ, অমর্ত্য সেন প্রমুখের বই ও চিন্তভাবনা ছিলো তাঁর বেশিরভাগ আলোচনার বিষয়। তবে সবার মধ্যে বার্ট্রান্ড রাসেল ও অমর্ত্য সেন তাঁর ভাবনাকে বেশি প্রভাবিত করেছেন।

তিনি নিজেও লেখালেখি করেছেন অনেক। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ছাড়াও তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: Development Mosaics, Piggyback Social Marketing Strategy for Health Program এবং An Educational Approach to Inclusion and Quality Improvement ইত্যাদি। উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ বিষয়ে তিনি ছিলেন দার্শনিকতুল্য। এসব নিয়ে ব্যাপক ও গভীর পড়াশুনা ছিলেন তাঁর। সিদীপে কর্মরত অবস্থায় আমি যা কিছু নতুন করতে চেয়েছি ও করেছি তার অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন শাহজাহান ভাই। মিডিয়ায় আমার প্রকাশিত প্রায় সব লেখাই তিনি পড়তেন ও মতামত জানাতেন। নতুন কিছু প্রবর্তন ও উদ্ভাবনকে তিনি সমাজের মূল চালিকাশক্তি মনে করতেন। নিরহংকার, বিনয়ী, অতি সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত, ও সাধারণ মানুষের জীবনের প্রকৃত উন্নয়নে ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই মানুষটি বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একেবারে প্রথম সারির মানুষদের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং তাদের পরিবর্তনের ও মুক্তির দর্শনে বিশ্বাস করতেন। বর্তমানে এনজিও জগতে যেসব পরিবর্তন বিশেষত করপোরেটমুখিনতা, তাঁকে খুবই পীড়িত করতো। সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের নামে যেসব এনজিও নেতারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে বেশি সক্ষমতা দেখিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভ ছিলো আপোশহীন। কোট-প্যান্ট-টাই পরা, এসি গাড়ি হাঁকানো ও রাজকীয় অফিস কক্ষে বসে বসে দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা বলে বেড়ানো অথচ জনবিচ্ছিন্ন এখনকার অনেক এনজিও কর্মকর্তাদের নিয়ে তাঁর বিদ্বেষ ছিলো তীব্র। উন্নয়ন নিয়ে যেকোনো কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তাকে তিনি টেকসইতার ও নৈতিকতার মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে দেখতেন।

শিক্ষালোক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ ছিলো তাঁর কাছে খুবই আগ্রহের। শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন, বই-আলোচনা কিংবা শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে সব অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতেন ও আলোচনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে ২৮শে জুন 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা: শতবর্ষের ভাবনা' নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তিনি। দুর্বল শরীরেও একটানা ৩ ঘণ্টার বেশি সেই অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন। অনেকের অনুরোধ উপেক্ষা করে সভাপতির সমাপনী আলোচনাটি করেন দাঁড়িয়ে। তাঁর দার্শনিকতাসমৃদ্ধ, গভীর ও বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা শ্রোতামণ্ডলিকে মুগ্ধ করতো।

বাংলাদেশের আরেক উন্নয়ন কর্মবীর সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ছিলেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর সেই অকৃত্রিম বন্ধু ও উন্নয়নের আরেক দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পর চলে গেলেন তিনিও।

সিদীপে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি ছিলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সিদীপের অফিসে আসলে আমার সঙ্গেই তিনি বেশি সময় কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমার একজন শ্রদ্ধেয় পরামর্শক ও অকৃত্রিম বন্ধু। আমাদের বেশ কয়েকটি লেখা যৌথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা একসঙ্গে আরও কিছু বড় কাজ করবো এরকম স্বপ্ন দেখতেন তিনি। তাঁর চিরবিদায়ে আমাদের সেসব স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যাবে। ওপারে ভাল থাকুন প্রিয় মানুষ শাহজাহান ভাই। আপনার শূন্যস্থান পূর্ণ হবার নয়।

-আলমগীর খান

তিনি বক্তৃতা করবেন, সারসংকলন টানবেন পুরো আলোচনার

শিশির মল্লিক

মানুষের মাঝে কিছু মানুষ তাদের কর্মের গুণে অনন্য হয়ে ওঠেন। সে মানুষটি যদি হন স্বপ্নবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল। আমরা বেশিরভাগ কীর্তিমান মানুষের গল্প শুনি বা জানি যারা ধর্মীয় প্রবক্তা, দার্শনিক, রাজনীতিক, শিল্প-সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞানে অবদান রাখেন তাদের। খবর রাখি না বহমান মানব সমাজের মূল শক্তি শ্রমিক-কৃষক ও পেশাজীবী মানুষের লাখো কোটি গল্পের। এসবকে মনে করি, এ আর কী! তার কাজ সে বিনিময়ের জন্যই করেছে অথবা সেটা তার কাজের অংশ ভাবি।

কথাগুলো এজন্য মনে করা যে, শাহজাহান ভুঁইয়ার মতো মানুষরা সেই সাধারণের মধ্যে ছিলেন। তারা সমাজের সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোয় কাজ করেছেন, তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা ভেবেছেন। জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে মানুষকে উৎপাদনক্ষম ও বিকশিত করার চেষ্টা করে গেছেন।

আবার আরেকটি বিষয় এই, ব্যক্তি মানুষ তার ইচ্ছাকে মেলে ধরতে পারে তখন, যখন তার কাজের জায়গাটি তার সেই ইচ্ছার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছায়ার মতো পাশে দাঁড়ায়। সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ভাইয়ের নামটি উল্লেখ করতেই হয়। আরেক স্বপ্নবান ও কল্যাণমূলক সমাজ উন্নয়নের রূপকার ছিলেন তিনি। সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি ও শিক্ষালোকের মতো প্রকাশনা এবং নতুন নতুন মানবিক উন্নয়নের প্রকল্পের সঙ্গে শাহজাহান ভুঁইয়ার সম্পর্ক ছিলো গভীর ও নানা সুপরামর্শ দিয়ে তাঁর অবদান রেখেছেন। শিক্ষালোকের সঙ্গে নানারকম অনুষ্ঠান আয়োজনে তাই সবসময় আমরা তাঁর সমর্থন পেয়ে এসেছি।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও শাহজাহান ভুঁইয়া দুজনই বিশ্বাস করতেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি তথা মানবিক উন্নয়ন ব্যতীত কোন উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন নয়। এ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে দুরাশা। তাই তাদের উভয়ের কীর্তিই আমি বলবো, সিদীপের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এই

শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়া। যার মধ্য দিয়ে আমার মতো একজনও তার সাথে জড়িয়ে গেছি।

পশ্চাৎপদ সমাজে বহুমানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি খুব সহজ বিষয় নয়। সিদীপের মাধ্যমে শাহজাহান ভাই এই কঠিন কাজটির মহাযজ্ঞে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা রেখে গেছেন। হঠাৎ করে তাঁর প্রয়াণ আমাকে ব্যথিত করেছে। একটা শূন্যতা তৈরি করেছে। তিনি নেই এটা ভাবা আমার পক্ষে কষ্টকর, মনে হয় তিনি আছেন; এইতো! হয়তো কোন অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা করবেন দৃঢ়তা নিয়ে, সারসংকলন টানবেন পুরো আলোচনার...।

লেখক: শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী

ওপারে ভাল থাকুন শাহজাহান ভাই

আবদুল হালিম খান

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপে বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে আলোচনাসভা, সেমিনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মাহবুব, ওদের সংস্থার সেসব অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ দেয়। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গুণীজনদের আলোচনা শুনে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করি। সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বইপ্রেমী মানুষ। হয়তো এ কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার একটা আলাদা টান অনুভব করি। বিশেষ করে তাদের ব্যতিক্রমী সভা ও সেমিনারগুলো আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হয়েও তারা নানারকম উদ্ভাবনী চর্চা করে থাকে। তারা যে সকল ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করে তার মধ্যে একটি হল বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার স্কুলে এক আলমারি বই দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বই পড়ার বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা। যা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার নামে পরিচিত। স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতেই তাদের এই উদ্যোগ। উদ্যোগটি গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

এই বইপড়া বিষয় নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে গিয়ে সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়ার সাথে আমার পরিচয় হয়। ছিপছিপে গড়নের দীর্ঘদেহী নিপাট ভদ্রলোক। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে আপন করে নেন। এরপর থেকে যতোবার সিদীপের অনুষ্ঠানে গিয়েছি তিনি তাঁর পাশে আমাকে বসিয়েছেন এবং নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। তাঁর এই অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা আমি কখনো ভুলতে পারবনা।

এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর তিনি তাঁর লেখা একটি কবিতার বই আমাকে উপহার দিয়ে বললেন, বইটি পড়ে আমি যেনো কিছু লিখি। তাঁর অনুরোধে বইটি পড়ে ছোট একটি পর্যালোচনা লিখেছিলাম। আমার আলোচনাটি পড়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। প্রায়ই তাঁর সাথে ফোনে কথা হতো। ফোন ধরেই বলতেন, আপনি আমার বাসায় বেড়াতে আসুন আপনার সাথে দীর্ঘসময় গল্প করব। আমিও তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। একদিন ফোন করে জানতে পারলাম তিনি কিছুটা অসুস্থ। তাই ভাবলাম তিনি সুস্থ হলে যাব। আমার দুর্ভাগ্য এর দু'দিন পরেই দুঃসংবাদটি পেলাম, শাহজাহান ভাই না ফেরার দেশে চলে গেছেন! শাহজাহান ভাই... একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আপনার সাথে আমার আর দেখা হল না!

পরজগতে আপনি ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা রইল।

লেখক: চেয়ারম্যান, আলম খান-তহুরুন্নেসা ফাউন্ডেশন, বিক্রমপুর

প্রিয়
শাহজাহান ভুঁইয়া স্যার

মো. জাহিদুল ইসলাম

চা বাগানের মাঝে বড় বড় গাছ লাগানো হয়, যেগুলোকে বলা হয় শেড ট্রি বা ছায়া বৃক্ষ। ছায়া বৃক্ষগুলো চা গাছকে সূর্যের প্রখর আলো এবং প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে ছায়া ও সুরক্ষা প্রদান করে, মাটির আর্দ্রতা ধরে রেখে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ঠিক তেমনি আমাদের মাঝেও বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক থাকেন যারা আমাদের চলার পথে দিকনির্দেশক হিসেবে সবসময় পাশে থাকেন এবং নানান প্রতিকূলতায় আমাদের আগলে রাখেন। আমাদের এ রকম একজন অভিভাবক ছিলেন সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া স্যার। তিনি গত ১৬ জুলাই ২০২৫ বার্ধক্যজনিত কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। চিন্তা, চেতনা ও মননে শাহজাহান ভুঁইয়া স্যার ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ।

স্যার ছিলেন বহুমুখী গুণের অধিকারী। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ উন্নয়ন কর্মী ও চিন্তক, লেখক, গবেষক, সুবক্তা এবং জ্ঞানপিপাসু মানুষ। স্যারের জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল আলোচনা বিমোহিত হয়ে শুনতাম। প্রতিষ্ঠানের সকল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষালোক আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানেই তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং অনুষ্ঠানকে আলোকিত করে রাখতেন। তিনি তার লেখনি ও সম্পাদনার মাধ্যমে সিদীপের প্রকাশনাকে করেছেন সমৃদ্ধ। 'দি এশিয়ান এজ' ও 'ঢাকা কুরিয়ার' ইংরেজি সংবাদপত্রে নিয়মিত স্যারের লেখা প্রকাশিত হতো। প্রতিটি লেখা প্রকাশ হওয়ার পর স্যার আমার মেসেঞ্জারে লেখার লিংক পাঠাতেন এবং দেখা হলে মুখে হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন- 'জাহিদ এই লেখাটা পড়েছেন?' 'হ্যাঁ স্যার, পড়েছি' বললে স্যার খুশি হতেন।

অফিসের পাশেই স্যারের বাসা হওয়ায় প্রায় সময়ই স্যারের সাথে দেখা হতো। যখনই দেখা হতো স্যার ডেকে খোঁজ-খবর নিতেন। স্যার সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ও সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। তার আচরণ ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অমায়িক। যার জন্য তার সাথে আলাপ করলে, মনের মাঝে একটা ভালোলাগা কাজ করতো। শিক্ষালোকে আমার লেখা প্রকাশ হলেই তিনি প্রশংসা করতেন এবং নিয়মিত লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন। স্যারের জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল অনুকরণীয়। বিভিন্ন সময় অফিসের কাজে তার বাসায় গেলে তিনি ঐ সময় যেই বইটা পড়তেন, সেই বইটার বিষয়বস্তু শেয়ার করতেন। সেই সাথে বেশি বেশি বই পড়ার পরামর্শ দিতেন।

স্যারের সঙ্গে আলাপ হলে উঠে আসতো সিদীপের কথা, মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যারের কথা। সিদীপের প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। অমায়িক আচরণে এবং উন্নয়ন চিন্তায় তিনি ছিলেন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যারের মতোই। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যার চলে যাওয়ার পর তাঁর মাঝেই খুঁজে পেতাম স্যারের ছায়া। সিদীপ পরিচালিত 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' ও 'সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি'র প্রতি স্যারের একটা দুর্বলতা ছিল। তিনিও মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যারের মতোই মনে করতেন যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ছাড়া গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির সাথে আমি জড়িত থাকার কারণে স্যারের সাথে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হতো। সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি'র উপর তার বইগুলো লেখার সময়ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেছেন তিনি। একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে তার নিকট থেকে যে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পেয়েছি, তা আমার জীবনে অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

বহুমুখী গুণের মধ্যে তার আর একটি গুণ ছিল স্যার সুন্দর গান গাইতে পারতেন। স্যারের গাওয়া 'সে তো এলো না/ সে এলো না/ কেনো এলো না/ জানি না ...' গানটি এখনো কানে বাজে। স্বাধীনতা সংগ্রামেও স্যারের রয়েছে অসামান্য অবদান। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলি তার মুখ থেকে শুনেছি বহুবার।

স্যারের লেখা 'স্বপ্নের পাখিরা' কবিতার বইয়ে লিখেছেন: 'এক জীবনে ফুল দিয়ে যাই/ বাধাই নাকো সমর/ হে দয়াময় মৃত্যু দিও/ কিন্তু রেখো অমর।' তিনি পৃথিবীর বুকে ফুল ফুটাতে চেয়েছেন, যেই ফুলের সুবাস ছড়াবে পৃথিবীময়। সেই সুবাসে তিনি মৃত্যুর পরও অমর হতে চেয়েছেন। তার অমায়িক আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের মাঝে যে সুবাস ছড়িয়েছেন, তার জন্য তিনি সত্যিই অমর হয়ে থাকবেন। বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, প্রিয় শাহজাহান ভুঁইয়া স্যার।

লেখক: উন্নয়নকর্মী (সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত)

শাহজাহান স্যারের সঙ্গে আমার ভ্রমণ

মাহবুব উল আলম

প্রায় ২ বছর হলো মাঠ থেকে প্রধান কার্যালয়ে আসলাম। আমার ডেস্ক সিদীপের এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের নিচ তলায়। সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান স্যারের বিল্ডিংয়ের প্রথম ২টি ফ্লোর নিয়ে এক্সটেনশন বিল্ডিং। সেখানে শাহজাহান স্যারের জন্যও একটি ডেস্ক ছিল যেখানে উনি মাঝে মাঝে বসে লেখালেখি ও গবেষণার কাজ করতেন। উনার ঠিক পাশেই আমার বসার সুযোগ হয়েছিল। সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যানের পাশে বসি এ নিয়ে মনে মনে গর্বিতও বোধ করতাম। যেহেতু স্যার মাঝে মাঝে আসতেন তাই দেখাও হতো মাঝে মাঝেই। তবে স্যার অফিসে আসা মানে ছিল আলমগীর ভাই আর উনার মাঝে দেশ ও দুনিয়া নিয়ে নানান আলোচনা, সেখানে উঠে আসতো দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিষয়আশয়ও। উনাকে দেখতাম আর ভাবতাম একটা মানুষ এতো জানে কীভাবে আর জানলেও আশির কাছাকাছি বয়সে এসে এতোকিছু মনে রাখে কীভাবে! টু দ্যা পয়েন্টে আলোচনা এবং অতি অবশ্যই রেফারেন্সসহ কথা বলতেন তিনি। ছিলেন একজন সুবক্তাও।

সাধারণত দেখা হলেই হাসি হাসি মুখ করে জানতে চাইতেন কেমন আছি। কিন্তু সেদিন হঠাৎ বললেন, বেশ কিছু দিন যাবৎ আগরতলা যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় গিয়েছিলাম, কতশত স্মৃতি জমে আছে। আরেকবার একটু ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু একা যাওয়ার সাহস করতে পারছি না। আপনি সাথে গেলে কয়েকদিন ঘুরে আসতাম। উনার মুক্তিযুদ্ধের আবেগ, সাথে আবার বয়সও প্রায় আশির কাছাকাছি, মনে হচ্ছিল যেন অনেকটা শেষ ইচ্ছার মতো।

একে তো সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান তার উপর আমার খুব শ্রদ্ধাভাজন মানুষ। যেমন জ্ঞানী তেমনই বিচক্ষণ। উনার সাথে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত থাকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় ভরপুর। বাংলাদেশের উন্নয়ন সেক্টরে এমন জ্ঞানী মানুষ খুব কমই আছে। খাঁটি উন্নয়নকর্মী বলতে যা বুঝায় তিনি ছিলেন ঠিক তাই। ছিলেন উন্নয়ন সংস্থার কর্পোরেটাইজেশনের ঘোর বিরোধী, খুবই সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত একজন নিখাদ ভাল মানুষ। একজন শিক্ষক, লেখক, সমাজচিন্তক কিংবা উন্নয়ন গবেষক যেকোন বিশেষণেই তাঁকে বিশেষায়িত করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন ১৯৬৭ সালে পেয়েছিলেন মিস্টার ইস্ট পাকিস্তান খেতাব, ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় ছাত্রনেতা, ৭১-এর রণাঙ্গনের যোদ্ধা, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় নিয়ে কখনো আত্মঅহমিকায় ভুগেননি, যেন এই যুদ্ধটা তাঁর দায়িত্বই ছিল। কখনো কোন সুযোগ সুবিধাও গ্রহণ করেননি, এমনকি মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেয়ার ব্যাপারেও কখনো আগ্রহী ছিলেন না। এইরকম একজন মানুষের সাথে ঘুরতে যাওয়ার মধ্যে একধরনের থ্রিলও অনুভব করছিলাম।

অবশেষে আগরতলা ভ্রমণের সেই ক্ষণ এলো গত বছর। আমাদের দুইজনের সাথে যুক্ত হলো আমার ছোটবেলার বন্ধু রায়হান। মুহূর্তেই মানুষকে আপন করে নেবার দারুণ ক্ষমতা ছিল শাহজাহান স্যারের। আবারও যার প্রমাণ পাই আগরতলায় কবি দিলীপ দাসের বাড়িতে গিয়ে। দিলীপ দাস আগরতলার কবি হলেও তার নাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গাঁথা। উনি নিজেকে এখনো তিতাস পাড়ের কবিই মনে করেন। সন্ধ্যায় স্যারকে নিয়ে যখন কবির বাড়ি গেলাম মনে হলো দুজন কতো চেনা মানুষ দীর্ঘদিন পর যেন দেখা হল! আমি আর রায়হান বসে দারুণ মুগ্ধতায় তাদের গল্প শুনছিলাম। দু'জনের সেই সৌজন্য সাক্ষাৎটি প্রায় দুই ঘণ্টা দীর্ঘায়িত হয়েছিল। বিদায় নেবার সময় শাহজাহান স্যার তার নিজের লেখা বেশ কয়েকটি বই কবিকে উপহার দিয়ে আসেন।

আগরতলায় আমাদের শেষ দিনটিকে রাঙিয়ে দিয়েছিল পার্থ দা। শুধু শাহজাহান স্যারের সম্মানে উনি উনার বন্ধুদের নিয়ে দিনব্যাপী একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা করেন। সকালে নাস্তার পরপরই তার ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে হাজির। আমাদের গন্তব্য সিমনার ব্রহ্মকুণ্ড গ্রাম। আগরতলা থেকে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। সেখানে পার্থদা'র বন্ধুবর বড় ভাই ধীমান দা'র মৎস খামার কাম রিসোর্ট। চা বাগান পেরিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তঘেঁষা ছায়া সুনিবিড় এক নিরিবিলি গ্রাম। সেখানে বিশাল এলাকাজুড়ে বেশ কয়েকটি পুকুর নিয়ে মৎস খামার। শৈশবের ন্যায় আনন্দঘন একটি দিন পার করে রাতে আগরতলা ফিরি। এবং পরদিন সবাই দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি।

পুরো ভ্রমণে শাহজাহান স্যারের এনার্জি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে একবারের জন্যেও উনাকে বৃদ্ধ কেউ মনে হয়নি। আমাদের সবার সাথে যেন তিনিও কৈশোরের আনন্দে ভেসেছেন, হেসেছেন বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে। সে ভ্রমণের রেশ এখনো কাটেনি। কিন্তু সবকিছু পেছনে ফেলে তিনি পাড়ি দিয়েছেন অনন্ত ভ্রমণে যেখান থেকে কেউ কখনো ফেরে না! আমাদের আরও একবার ভ্রমণে বের হওয়ার কথা ছিল স্যার, আপনার শূন্যতা শুধু আমি না পুরো সিদীপ পরিবার আরও অনেকদিন বয়ে বেড়াবে। আপনি ওপারে ভাল থাকুন প্রিয় শাহজাহান স্যার।

লেখক: গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সিদীপ

প্রয়োজনের কথামালা

শাহজাহান ভুঁইয়ার স্মরণে

মাহফুজ সালাম

পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি ছিপছিপে দীঘল শরীর
সমস্ত শরীর জুড়ে শ্রমের কাদামাটি
রক্তের লোনা জল, জলের
স্রোতধারায় মলিন ধুলার বিবর্ণ প্রতাপ
সত্যের অন্বেষায় চোখ পড়ে তার ঐশ্বর্য
ধর্ম দর্শন সভ্যতার মায়াময় পালাবদল
বিজ্ঞানের পাতায় এগিয়ে যাওয়া কালের যাত্রাধ্বনি।

তার স্মরণ শক্তি নীরব রাত্রির নির্জনতায়
থরে থরে বিন্যস্ত থাকতো হৃদয় মোহনায়।

দীর্ঘ সময়ের সরোবরে অবগাহন
সুবিন্যস্ত ঘটনাপঞ্জি দেখা-অদেখার কৌতুহল
বেজে উঠতো তার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে,
মাউথ পিসের ইথারে–
প্রজ্ঞার বলকে মুগ্ধ শ্রোতার বিস্ময়।

লেখালেখি কবিতায় দৃশ্যমান তাঁর উপস্থিতি
তিনি যেন ফিরে আসবেন বার বার
আমাদের প্রয়োজনের কথামালায়।

‘এবং বই’ ও ‘শিক্ষালোকে’র আয়োজনে ‘মাতৃভাষা ও শিক্ষা’ গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা

২৮ জুন বিকালে ঢাকায় সিদীপ মিলনায়তনে প্রকৃতি ও সিদীপ প্রকাশিত প্রবন্ধসংকলন ‘মাতৃভাষা ও শিক্ষা: শতবর্ষের ভাবনা’ গ্রন্থটি নিয়ে ‘এবং বই’ ও ‘শিক্ষালোক’র যৌথ আয়োজনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অক্ষয় কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ের অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম পর্যন্ত প্রথিতযশা লেখকদের মোট ৮টি লেখা নিয়ে সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশিত।

সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ‘এবং বই’-এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক জাভেদ হুসেন, ইউল্যাব শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কুদরতে খোদা, এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক ফাতিহুল কাদির সম্রাট, লেখক-গবেষক সালেহা বেগম, কবি শামসেত তাবরেজী, সাহিত্যিক আহমেদ বশির, শিল্পী শিশির মল্লিক, মাহফুজ সালামসহ অনেকে।

জাভেদ হুসেন ‘মাতৃভাষা ও শিক্ষা’ বইটি নিয়ে তার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, রাজার ১০০০ চোখ থাকলেও যখন শিক্ষার ব্যাপার আসে তখন তার ৯৯০টি চোখ বন্ধ হয়ে যায়। বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় তিনি বলেন বইটিতে নির্বাচিত লেখাসমূহে বাংলাভাষা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম ও চিন্তাচেতনার বিবর্তনের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রধান অতিথি শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল, সেজন্য আমরা ভাষাসহ সবকিছুতেই পরনির্ভরশীল। তিনি বলেন, আমাদের বাংলা ভাষার চর্চা যেমন বাড়াতে হবে ঠিক তেমনি প্রযুক্তির দিকেও নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অধ্যাপক কুদরতে খোদা বইটি নিয়ে আলোচনায় একে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হিসেবে উল্লেখ করেন।

আলোচকগণ বাংলা ভাষাকে জাতীয় জীবনে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য ‘মাতৃভাষা ও শিক্ষা’ বইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

ইয়া মনির বই পড়ার গল্প

কাকলি খাতুন

পুরস্কার গ্রহণ করছে ইয়া মনি

বইয়ের মতো এত বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই। বই পড়া একদিকে যেমন মানুষের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায় অন্যদিকে তেমনি উন্নততর হয় মানুষের ভাষা জ্ঞান। বই আমাদের মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায়।

আমাদের প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যারের বই পড়ার প্রতি ছিল এক প্রবল নেশা, তিনি বই পড়তে খুবই ভালোবাসতেন। বই পড়ার প্রতি যে প্রবল আগ্রহ ও ভালোবাসা ছিল সেই আগ্রহ ও ভালোবাসা কিশোর কিশোরীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ২০২২ সাল থেকে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার নামে মুক্তপাঠাগারের কার্যক্রম শুরু হয়।

শুরুতেই বলা ভালো, এই পাঠাগারের নাম মুক্তপাঠাগার এই জন্য যে এই পাঠাগারটি সবসময় সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। এখান থেকে পাঠক ইচ্ছামতো বই নিতে পারেন ও ফেরত দিতে পারেন। এখান থেকে বই নেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম পালন করতে হয় না।

কোমলমতি শিশু, কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে বই প্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই মুক্তপাঠাগারের লক্ষ্য। আমাদের সবগুলো মুক্তপাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই সেখান থেকে বই নিয়ে পড়তে পারে। অবসরে বই পড়ার ফলে তারা মোবাইল আসক্তি, কিশোর অপরাধ ও বিভিন্ন অসামাজিক অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারবে। এছাড়াও একটি ভালো বই হলো বর্তমান ও চিরকালের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু।

এরই ধারাবাহিকতায় ৫ জানুয়ারি ২০২৩-এ সিদীপের দেবোত্তর শাখার পাশেই অবস্থিত দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার অনুমতিক্রমে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার স্থাপন করা হয়, এটাকে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেশ উৎসাহ, আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই কার্যক্রমের সাথে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। দিন দিন এর পাঠক সংখ্যাও বাড়তে থাকে ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সুন্দর এক বই পড়ার প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। তাদের এই কার্যক্রমকে ধরে রাখতে ও আরো আগ্রহ বৃদ্ধি করতে আমরা সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচনের মাধ্যমে ছোট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। এতে তারা বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত হয়।

এই বই পড়া প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী নির্বাচন করতে গিয়ে পরিচিত হই ঐ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী ইয়া মনির সাথে। সে এই পর্যন্ত মুক্তপাঠাগার থেকে প্রায় ১০০টির মতো বই পড়েছে।

পাবনা জেলার আটঘড়িয়া উপজেলার বিশ্রামপুর গ্রামের ছোট্ট শিশু ইয়া মনি ২০২৩ সালে দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। স্কুলে ভর্তি হয়েই সে দেখতে পায় তার বিদ্যালয়ের বারান্দার দেয়ালে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। সে খুব উচ্ছ্বসিত হয় এই মুক্তপাঠাগার দেখে। বাবা মঞ্জুরুল ইসলাম ও মা মাহফুজা খাতুনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে, খুব ছোট বেলা থেকেই বই পড়ার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ। তার সংগ্রহে আছে অনেক শিশুতোষ বই যেগুলো সে পড়তে ভালোবাসে। বাবা, মা ও পরিবারের সবাই তাকে এই বিষয়ে বেশ উৎসাহ দিয়ে থাকেন। ইয়া মনির মায়ের সাথে কথা বলে আরো জানতে পারি যে, সে মুক্তপাঠাগার থেকে প্রায় সময় অনেক কঠিন কঠিন বই নিয়ে যায় যেগুলো তার পক্ষে পড়ে বুঝতে পারা সম্ভব নয় যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবদাস, পথের দাবী, রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীরপত্র, শেষের কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ রচনা বই পড়া এ রকম আরো অনেক বই যেগুলো সে মাকে পড়ে শুনাতে বলে। এর মাধ্যমে তার মায়েরও মুক্তপাঠাগারের অনেকগুলো বই পড়া হয়েছে এবং তিনিও নিজেকে মুক্তপাঠাগারের একজন পাঠক হিসেবে দাবি করেন।

মুক্তপাঠাগারে তখন বইয়ের সংখ্যা ছিল ১৫০ এর মতো তার মধ্যে প্রায় ১০০টি বইই পড়া হয়েছে তার। বাকি বইগুলো তার জন্য বুঝতে পারা কঠিন হলেও সে বেশ আগ্রহের সাথে বাসায় নিয়ে যেতো পড়ার জন্য। ইয়া মনি যেমন বই পড়তে ভালোবাসে তেমনি ভালো ছবিও আঁকে। তাছাড়া সে পড়াশুনাতেও বেশ মেধাবী। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পাবনা থেকে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সে প্রথম স্থান অর্জন করে। এছাড়াও ৪টি স্কুলের সাথে উপস্থিত বক্তৃতা ও স্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়াও সে ভালো গান ও নাচ করে। তার এই সবগুলো প্রতিভাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বই পড়া। বই পড়া তার একটি নেশায় পরিণত হয়েছে। অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাও মুক্তপাঠাগারের এই মহৎ উদ্যোগ ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বই পড়ার এই আগ্রহকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ইয়া মনি বলে, মুক্তপাঠাগার তার বই পড়ার আগ্রহকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তপাঠাগার বইপ্রেমী মানুষ ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও অনুপ্রেরণার উৎস। মুক্তপাঠাগারে রয়েছে প্রায় সব বয়সী মানুষের জন্য পাঠ্য উপযোগী বই। পাঠক এখান থেকে ইচ্ছেমতো বই নির্বাচন করে পড়ে ফেরত দিতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষিকাদের আন্তরিক সহযোগিতায় চলমান রয়েছে আমাদের এই কার্যক্রম। শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও পাঠকদের চাওয়া মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের এই কার্যক্রম যেন অব্যাহত থাকে। পাঠাগারের সংখ্যা ও পাঠকের সংখ্যা দিনে দিনে আরো যেনো বৃদ্ধি পায়। সফল হোক মুক্তপাঠাগারের মহৎ এই উদ্যোগ।

লেখক: শিক্ষা সুপারভাইজার, দেবোত্তর ব্রাঞ্চ, সিদীপ

দাদ রোগ

সাজ্জাদ হোসাইন

এটি একটি সংক্রামক চর্মরোগ। দাদ রোগের প্রধান কারণ হলো ছত্রাক (ফাঙ্গাস) সংক্রমণ। একে Ringworm বা Tinea বলাহয়।

এটি শরীরের যে কোনো অংশে হতে পারে–মাথা, কুঁচকি, পেট, হাত, পা এমনকি নখেও। ঘাম জমে থাকা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় (উদাহরণ: কুঁচকি, আঙুলের ফাঁক, স্তনের নিচে) সংক্রমণ বেশি হয়।

সংক্রমণের স্থান অনুযায়ী এর নাম বিভিন্ন হয়ে থাকে যেমন:

- কুঁচকিতে: টিনিয়া ক্রুরিস
- মাথার তালুতে: টিনিয়া ক্যাপিটিস
- পায়ের পাতায়: টিনিয়া পেডিস,
- নখে হলে: টিনিয়া আঙ্গুয়াম
- হাতে: টিনিয়া ম্যানুয়াম এবং
- শরীরের অন্য অংশে: টিনিয়া কর্পোরিস ইত্যাদি।

দাদ রোগের লক্ষণ:

- গোলাকার লালচে র‍্যাশ, দেখতে আংটির মতো হয়।
- আক্রান্ত স্থানে চুলকানি, জ্বালাপোড়া, ত্বক খসখসে হয়।
- পায়ের আঙুলের ফাঁকে চুলকানি হয় ও চামড়া ওঠে যায়।
- আক্রান্ত স্থানের চুল বা লোম পড়ে যায়।

দাদ রোগের কারণ:

ডারমাটোফাইটোসিস (Dermatophytosis) নামক ছত্রাক ত্বকের উপর আক্রমণ করে দাদ সৃষ্টি করে।

- অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকলে।
- অপরিষ্কার ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে বসবাস করলে।
- অতিরিক্ত ঘাম হলে, আঁটসাট পোশাক পরিধান করলে।
- সংক্রামিত ব্যক্তির জিনিস ব্যবহার করলে।
- রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে গেলে, ডায়াবেটিস, এইচআইভি ক্যান্সার হলে কিংবা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে সহজে দাদ রোগ ভাল হয় না।

ডায়াবেটিস রোগীদের দাদ বেশি হয়:

- রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজের কারণে ছত্রাক গ্লুকোজকে পুষ্টি হিসেবে ব্যবহার করে।
- এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে।
- ডায়াবেটিসে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে সহজে ফাটে ও সংক্রমণ হয়।

দাদ-রোগ প্রতিরোধের উপায়:

- রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ রাখা।
- ত্বক পরিষ্কার ও শুকনো রাখা।
- সুতি কাপড় ও ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা।
- অন্যের ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার না করা।
- পোষা প্রাণীর ত্বকে দাগ বা চুলকানি থাকলে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া এবং যে কোনো সমস্যা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা।

চিকিৎসা:

- চিকিৎসকের পরামর্শে ছত্রাকনাশক ওষুধ (ট্যাবলেট, মলম) সেবন ও ব্যবহার করা।
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা।

লেখক: উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার
বেতকা ব্রাঞ্চ, সিদীপ।

বেল

মো. মোজাম্মেল হক

বেল একটি পুষ্টিকর এবং উপকারী ফল। বেল, কাঁচা ও পাকা দুই অবস্থায়ই সমান উপকারী। কাঁচা বেল ডায়রিয়া ও আমাশয় রোগে ধন্বন্তরি। পাকা বেলের শরবত সুস্বাদু। বেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের মত মূল্যবান পুষ্টি উপাদান।

বেলের বৈজ্ঞানিক নাম Aegle marmelos Correa (syn. Feronia pellucida Roth, Crataeva marmelos L)। বেল রুটাসি (Rutaceae) অর্থাৎ লেবু পরিবারের সদস্য। এর সংস্কৃত নাম বিল্ব। বেলের জন্ম ভারতবর্ষে। বেল গাছ বড় ধরনের বৃক্ষ যার উচ্চতা প্রায় ১০-১৬ মিটার। শীতকালে সব পাতা ঝরে যায়, আবার বসন্তে নতুন পাতা আসে। পাতা ত্রিপত্র যুক্ত, সবুজ, ডিম্বাকার এবং পত্র ফলকের অগ্রভাগ সূঁচাল। ফুল হালকা সবুজ থেকে সাদা রঙের। বোঁটা ছোট, ৪-৫টি পাঁপড়ি থাকে, পুংকেশর অসংখ্য, গর্ভাশয় বিস্তৃত ও কেন্দ্রস্থল খোলা। ফলে মিষ্টি গন্ধ আছে। ফল বড়, গোলাকার, শক্ত খোসা বিশিষ্ট। ফলের ভিতরে শাঁস ৮-১৫টি কোয়া বা খণ্ডে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি ভাগে বা খণ্ডে চটচটে আঠার সাথে অনেক বীজ লেগে থাকে। কাঁচা ফলের রঙ সবুজ, পাকলে হলদে হয়ে যায়। ভিতরের শাঁসের রঙ হয়ে যায় কমলা বা হলুদ। পাকা বেল থেকে সুগন্ধ বের হয়। পাকা বেল গাছ থেকে ঝরে পড়ে। গাছ যখন ছোট থাকে তখন তাতে অনেক শক্ত ও তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে। গাছ বড় হলে কাঁটা কমে যায়।

বেলপাতা

অনেকে মনে করেন প্রতিদিন একটি করে বেল পাতা ঘি দিয়ে ভেজে চিনিসহ খেলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে। বেলপাতা ত্রিফলক যুগ্মপত্র। অর্থাৎ একটা বোটায় তিনটি করে পাতা থাকে। বেল পাতায় aegeline নামক এক প্রকার উপাদান থাকে যা ওজন কমানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

বেলের খাদ্যগুণ

১০০ গ্রাম বেলের শাঁসে থাকে; পানি ৫৪.৯৬-৬১.৫ গ্রাম, আমিষ ১.৮-২.৬২ গ্রাম, স্নেহ পদার্থ ০.২০-০.৩৯ গ্রাম, শর্করা ২৮.১১-৩১.৮ গ্রাম, ক্যারোটিন ৫৫ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.১৩ মিলিগ্রাম, রিবোফ্ল্যাবিন ১.১৯ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ১.১ মিলিগ্রাম, এসকর্বিক এসিড ৮-৬০ মিলিগ্রাম, এবং টারটারিক এসিড ২.১১ মিলিগ্রাম।

বেলের ভেষজগুণ

বেল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ও আমাশয়ের উপকার করে। আধাপাকা সিদ্ধ বেল আমাশয়ে অধিক কার্যকরী। বেলের শরবত হজমশক্তি বাড়ায় এবং তা বলবর্ধক। বেলের পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে পান করলে চোখের ছানি ও জ্বালা উপশম হয়। পাতার রস, মধু ও গোল মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে পান করলে জন্ডিস রোগ নিরাময় হয়। পেট খারাপ, আমাশয়, শিশুর স্মরণশক্তি বাড়ানোর জন্য বেল উপকারী। বেলে প্রচুর ভিটামিন সি আছে। এই ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বেল নিয়মিত খেলে কোলন ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে কমে যায়।

সতর্কতা

বেল শরীরের জন্য উপকারী হলেও অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। বেল খাওয়ার পরিমাণ অতিরিক্ত হলে শরীরের ওজন বেড়ে যেতে পারে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।

লেখক: উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, মাওনা ব্রাঞ্চ, সিদীপ

গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা

শান্ত কুমার দাস

দারিদ্র্য অন্যতম বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। যুগে যুগে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেকেই বিভিন্ন মডেল বা কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন। সেগুলোরই একটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রায় পাঁচ দশক ধরে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকাসহ গ্রামাঞ্চলে বিপুল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। দেশের দারিদ্র্য সূচক নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে রাখছে উল্লেখযোগ্য অবদান। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। ঋণ নিয়ে নারী ও পুরুষ আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন।

নারীরা গৃহস্থালির কাজকর্মের পাশাপাশি মাঝারি ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে হাঁস-মুরগি-গবাদিপশু পালনসহ বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। অন্যদিকে, পুরুষরা ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে পুকুরে মাছ চাষসহ বনায়ন, স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছেন।

জাতীয় দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার এক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, দেশে গত বছরের জুন শেষে ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহক ছিল ৬ কোটি ৬৮ লাখ ২০ হাজার। তাদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে প্রায় দুই লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকের সঞ্চয় ছাড়িয়েছে ৯০ হাজার কোটি টাকা। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে ৭৩১টি প্রতিষ্ঠান ২৫ হাজারের বেশি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চাই যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ। সেক্ষেত্রে কৃষি অর্থনীতি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ও গতিশীল রাখা জরুরি। ক্ষুদ্রঋণপ্রাপ্ত পরিবারগুলো উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন- হাঁস-মুরগি-গবাদিপশুর খামার, দুগ্ধ খামার, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সবজি বাগান, মাছ চাষ, দোকান ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজ করে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারছেন।

আবার এগুলো দেশজ উৎপাদনেও সহায়ক শক্তি হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর– এমএফআই ও এনজিও সেক্টর। কাজেই এসব সেক্টরের উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি গতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং নানাবিধ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তুলনামূলক সহজ হয়ে উঠতে পারে।

লেখক: ক্ষুদ্রঋণ কর্মকর্তা, সিদীপ

রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

মো. শহিদুল ইসলাম

ভূমিকা: ক্ষুদ্রঋণ হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা। গোষ্ঠীভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীনে উৎপাদন, উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণ, মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আর এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য দক্ষ নৈতিক দায়িত্ববান কর্তব্যপরায়ণ কর্মী প্রয়োজন। স্বল্পপরিমাণ ঋণের বর্ধিতাংশ বেকার দরিদ্র উদ্যোক্তা এবং দরিদ্রভাবে বসবাস করে এমন জনগোষ্ঠী যারা সাধারণ ব্যাংকগুলোর ঋণের আওতায় আসতে পারেনা তাদের সহজ শর্তে জামানাতবিহীন বা ক্ষেত্র বিশেষে স্বল্প জামানতে এই ঋণ প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের কিছু নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা আমার আলোচনায় স্পষ্ট করার চেষ্টা করব-

সময়মত অফিসে উপস্থিত হওয়া: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কর্মীর প্রথম নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হল সঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়া, সময়মতো মাঠ পর্যায়ের কাজের জন্য মুভমেন্ট করা। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অবশ্যই সঠিক সময়ে সমিতির সদস্যদের কাছে পৌঁছানো।

সমিতি পরিদর্শন করা: নিয়মিত সমিতি পরিদর্শন করে সমিতির সদস্যদের খোঁজ খবর নেওয়া। একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে সমিতি কালেকশন করা। সমিতির সকল সদস্যের পাশ বই যাচাই এবং মাসের প্রথমে কালেকশন শীটের সাথে মিলিয়ে লাল কালি দিয়ে টিক দেওয়া। সমিতির মিটিং রেজ্যুলেশন খাতা হাল নাগাদ রাখা। সদস্যদের খোঁজ খবর নেওয়া, এছাড়াও প্রতিটি সদস্যের বাড়ি চেনা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এ সকল কাজ নিয়মিত পালন করলে সংস্থা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

সদস্য ভর্তি করা: সদস্য ভর্তি হতে চাইলে যাচাই বাছাই করে ভর্তি করা। ভর্তি করার সময় অবশ্যই সদস্যের বাড়ি, প্রকল্প এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ধাপ হল ভাল সদস্য ভর্তি করা। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে যাচাই ছাড়া সদস্য ভর্তি হলে সমস্যার অন্ত থাকেনা।

ঋণ প্রস্তাব করা: সদস্য ঋণ প্রস্তাবনা করলে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করে ঋণ প্রস্তাব করা কর্মীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজটি দায়িত্ব সহকারে পালন করলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

দিনের আদায় দিনে শেষ করা: কর্মীর প্রতিদিনের আদায়যোগ্য জানা এবং প্রতিদিন আদায়যোগ্য অনুযায়ী সঠিক সময়ের মধ্যে আদায় করা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে কর্মীকে আন্তরিক হতে হবে।

সঠিক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা: ঋণ বিতরণের পূর্বে সদস্যের প্রকল্প সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সঠিক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করলে কিস্তি আদায়ে কোন সমস্যা হবে না অন্যথায় কিস্তি আদায়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হবে।

বকেয়া আদায় করা: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল বকেয়া। কর্মীর দায়িত্ব হল বকেয়া সদস্যের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা। কর্মীকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নিজের অবহেলার কারণে বকেয়া না পড়ে।

সমিতি পরিচালনার দক্ষতা থাকতে হবে: নতুন সমিতি গঠন করার এবং সমিতি সঠিকভাবে পরিচালনা কর্মীর দায়িত্ব। সমিতির মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিক সমাধান করা। তাহলে সমিতি ভাল থাকবে, সদস্যের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে, সমিতির কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে।

দৈনিক কালেকশন শীট যাচাই করা: সদস্যের সঞ্চয় কিস্তির টাকা সঠিকভাবে জমা করা কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এ কাজটি নিয়মিত বাস্তবায়ন করলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মানসম্মত হয়।

ঋণ বিতরণ ও সঞ্চয় ফেরত প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে করা: ঋণ বিতরণ ও সঞ্চয় ফেরত দেওয়ার সময় প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রদান করা কর্মীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি বাস্তবায়ন করলে ভুল-ত্রুটি কম হয়, কাজের মান বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়।

বাৎসরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা: প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে কর্মীর বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং এটি মাসভিত্তিক ধারাবাহিক টার্গেট ও এচিভমেন্ট করা কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। কেননা বাৎসরিক এচিভমেন্টের উপর কর্মীদের সুযোগ সুবিধা এবং বেতন বৃদ্ধি নির্ভর করে। কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে টার্গেট ও এচিভমেন্ট করলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বেগবান হয়।

সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করা: সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করা এবং ক্রস চেক করা কর্মীর দায়িত ও কর্তব্য। নির্ভুল প্রতিবেদন কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন তৈরির মাধ্যমে কর্মী তার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারনা পেয়ে থাকে। কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি পায়।

সময়ের মূল্যায়ন করা: যে কোন কাজের পূর্বে সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মান বৃদ্ধির জন্য কর্মীকে কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করে কাজ করা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জবাবদিহিতা: কর্মীকে সকল কাজের জবাবদিহিতার মানসিকতা থাকতে হবে। জবাদিহিতা কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে এবং কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা আনয়ন করে। স্বচ্ছতার সাথে কাজ করলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুনগতমান বৃদ্ধি পায়।

সততা ও মূল্যবোধ: কর্মীর মধ্যে সততা ও মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন। আর এগুলো কর্মীকে দায়িত্ববান ও পরিশ্রমী হিসেবে গড়ে তোলে। একজন দায়িত্ববান কর্মী প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ। কর্মীর সততা ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে।

নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া: সংস্থার নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তা মেনে কাজ করা কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। নিয়ম মেনে কাজ করলে কাজের মান এবং সংস্থার সুনাম বৃদ্ধি পায়।

দূরদর্শীতা থাকতে হবে: কর্তব্য ও দায়িত্ববান কর্মীর মধ্যে দূরদর্শীতা থাকতে হবে। কোন সমস্যার পূর্বে সঠিক অনুমান করতে পারতে হবে। তাহলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা: কথায় আছে "আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী"। কর্মীকে অবশ্যই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, মার্জিত পোশাক এবং পরিপাটি হয়ে মাঠে যেতে হবে। কেননা একজন কর্মী সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। তাই কর্মীর অব্যশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মার্জিত পোশাক পরা দায়িত্ব ও কর্তব্য। এতে মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাওয়া যায় এবং পরিচিতি লাভ করা যায় ফলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।

ভাল ব্যবহার করা: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের সাথে ভাল ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যদের সাথে সু-সম্পর্ক এবং আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। সদস্যের ছোট সন্তানদের আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে সদস্য খুশি হয়। যার ফলে ঋণের কিস্তি আদায়ে সমস্যা কম হয়।

প্রচার-প্রচারণা করা: কথায় আছে "প্রচারেই প্রসার"। প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা সমিতি পর্যায়ে প্রচার প্রচারণা করা কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মূল ভিত্তি হল সমিতি। সমিতির মাধ্যমে সকল সদস্যের মাঝে প্রতিষ্ঠানের সকল সুবিধাসমূহ আলোচনা করা যায়। প্রতিষ্ঠানের নাম এবং সুযোগ সুবিধাসমূহ সম্পর্কে সদস্যদের অবগত করা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ধৈর্য ও চাপ নেওয়ার মানসিকতা: কর্মীদের ধৈর্য ও কাজের চাপ নেওয়ার মন মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। ধৈর্য, আন্তরিকতা ও কাজের চাপ নেওয়া মানসিকতার মাধ্যমে একজন দায়িত্ববান কর্মীর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুনগতমান বৃদ্ধি করতে পারে।

চিঠি ও সার্কুলার চর্চা করা: কর্মীদেরকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের চিঠি ও সার্কুলার নিয়মিত চর্চা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের চিঠি ও সার্কুলার মেনে কাজ করলে কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

একতাবদ্ধ কাজ করার মানসিকতা: বাংলায় একটি প্রবাদ আছে "দশের লাঠি একের বোঝা" কোন কাজের সফলতা অর্জনের জন্য কর্মীদের মাঝে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সকল কর্মী একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।

হিসাব নিকাশে স্বচ্ছতা: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে যেহেতু আর্থিক লেনদেন থাকে সেহেতু কর্মীদের মাঝে অবশ্যই হিসাব নিকাশে স্বচ্ছতা থাকা আবশ্যক। কর্মীদের মাঝে হিসাব নিকাশে স্বচ্ছতা থাকলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

> ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন একজন দক্ষ কর্মী। আর কর্মীর দক্ষতা নির্ভর করে তার নৈতিক আচার আচরণ ও আন্তরিকতার মধ্যে। প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও আন্তরিকতার উপর

লোভ পরিহার করা: লোভ মানুষকে বিবেকহীন পশুর মত করে তোলে। কর্মীদের লোভ পরিহার করা নৈতিক দায়িত্ব। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে নগদ অর্থ লেনদেন হয়। তাই অর্থের লোভ পরিহার করে কাজ করলে অনিয়ম কম হবে ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

আমানত রক্ষা করা: ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের পাশাপাশি সদস্যদের আমানতও গ্রহণ করে থাকে। আর এ আমানত কর্মীদের মাধ্যমে সদস্যগণ জমা প্রদান করে। থাকে। তাই আমানত রক্ষা করা কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সঠিকভাবে এ কাজ পরিচালিত হলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

চরিত্রবান হওয়া: চরিত্র একটি অমূল্য সম্পদ। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কর্মীদেরকে সু-চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। যেহেতু গ্রাহকের একটা বড় অংশ নারী তাই ক্ষুদ্রঋণ কর্মীদের নারীদের সাথেই কাজ করতে হয়, ফলে কর্মী যদি সৎ চরিত্রের অধিকারী না হয় তবে নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

তথ্য গোপন না করা: কর্মীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হল যে কোন অন্যায় হলে সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানো এবং কোন তথ্য গোপন না করা। তাহলে সাথে সাথে সমস্যা চিহ্নিত করতে সুবিধা হয় এবং সমস্যা অনুযায়ী সমাধানে ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। যার ফলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রসারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি কম হয়।

কর্ম এলাকার মানুষের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা: কর্মীর কর্ম এলাকার মধ্যে বয়সে বড়দের সালাম ও শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ, ভালবাসা দিতে হবে। ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে হবে। এতে করে এলাকায় কোনরূপ সমস্যা হলে এলাকার মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায়। কর্ম এলাকার মানুষের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা কর্মীদের দায়িত্ব।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন একজন দক্ষ কর্মী। আর কর্মীর দক্ষতা নির্ভর করে তার নৈতিক আচার আচরণ ও আন্তরিকতার মধ্যে। প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও আন্তরিকতার উপর।

লেখক: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এনায়েতপুর ব্রাঞ্চ

বিধাতা

আবুল কালাম তালুকদার

তোমার স্নেহের ছায়ায় রেখো আশ্রয়ে
রুখে প্রকৃতির দাপট
দূর করো ক্রোধ, হিংসা, অমানবিক আচরণ
আয়েশি আদরে তুমি আমাদের করো মোহনীয়
ধরনীর সবখানে আমাদের জন্য তৈরি করো
ছায়াবিথীর আশ্চর্য ফুলেল বাগান
জীবনের রহস্য অন্ধকার মুছে দিয়ে জ্বালাও সুখের প্রদীপ
সমস্ত আকাশ ভরে দিও সৌন্দর্যে ভরা সুবাতাসে
তুমি ভালোবেসে আমাদের চিরদিন তোমার
সুখের সামিয়ানায় দিও ঠাঁই
জালিমের সব জুলুম হতে
তোমার অদৃশ্য শক্তিতে আমাদের করো রক্ষা।

জীবনযুদ্ধে সফল এক কৃষক ও কৃষাণী

মো. ইসরাফিল হোসেন

একজন কঠোর পরিশ্রমী কৃষক পরিবারের সন্ধান পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম পাবনায়। ২৬ আগস্ট বিকেলে যখন তার দেখা পেলাম তিনি তখন শিম খেতে কাজ করছিলেন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু জমে থাকা পরিশ্রমের ঘাম রোদের ছোঁয়ায় মুক্তো দানার মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। জানতেন আমরা আসবো, তারপরও আমাদের দেখে কিছুটা বিচলিত হলেন যেন। হাতে ধরা নিড়ানিটি ফেলে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কথা বলতে বলতে তার বাড়িতে আসার পর তার স্ত্রী মোছা. রাখি খাতুন রান্না ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। এক লড়াকু দম্পতির সহৃদয় সম্ভাষণে আমরা প্রীত হলাম।

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুরিয়া ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা মোছা. রাখি খাতুন, স্বামী মো: শহিদুল ইসলাম। পৈতৃক ভাবেই পাওয়া ১ বিঘা জমিতে মো: শহিদুল ইসলাম ও তার স্ত্রী রাখি খাতুন কৃষিকাজ করেন এবং কৃষিই তাদের একমাত্র আয়ের পথ। এছাড়া রাখি খাতুনের স্বামী মো: শহিদুল ইসলাম অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রয় করেন। কিন্তু এই কৃষি ও শ্রম বিক্রয় থেকে তাদের যে পরিমাণ আয় হত তা দিয়ে অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের সংসার চলত। তার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ৪। ১ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং তারা ২ জন স্বামী স্ত্রী। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে কঠোর পরিশ্রম করে যে কৃষি খামার সফলতার সাথে গড়ে তুলেছেন তা গর্ব করে বলার মতো। তবে তাদের এই পথটি বেছে নেয়ার এবং তাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভের পেছনে রয়েছে এক অকুতোভয় জীবন সংগ্রামের গৌরবময় কাহিনি। যে কাহিনি অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায়। সিদীপ বরাবরই এ ধরনের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে থাকে। রাখি খাতুনের বেলায়ও তেমনটিই ঘটেছে। নিজের উন্নয়ন প্রয়াসে তিনি সব সময়ই সিদীপকে পাশে পেয়েছেন।

এরপর রাখি খাতুন মনে মনে ভাবতে থাকেন কৃষি ফসল চাষাবাদ করে এই কৃষি খামারটিকে কী করে আরো লাভজনক করে তোলা যায়। এক সময় ঠিক করে ফেলেন এনজিও থেকে ঋণ নেবেন। তার এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে যুক্তিটা ছিল তা হচ্ছে– বিভিন্ন কৃষি ফসল বিক্রয় করে তিনি কিস্তির টাকা পরিশোধ করবেন, বছর শেষে বন্ধক নেওয়া জমির টাকা থেকে যাবে মূলধন হিসেবে।

পাড়া-প্রতিবেশির নিকট থেকে রাখি খাতুন জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও এক ধরনের ঋণ দেয় যার কিস্তি ৬ মাস বা ১ বছর

এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং তার মধ্যে এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে সবজি চাষ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়টি রাখি খাতুন তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন এবং ঋণের টাকা দিয়ে তাদের সবজি খেতের জমিতে সবজি চাষ এবং আরও জমি বৃদ্ধি করে সেই জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া সম্ভব বলে রাখি খাতুন তার স্বামীকে জানান। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তব সম্মত বলে স্বামী শহিদুল ইসলাম স্ত্রীর কথায় সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তাদের বাড়ির পাশেই ছিল সিদীপের কালিকাপুর মহিলা সমিতি। রাখি খাতুনকে উক্ত সমিতিতে ভর্তি হতে পাঠান। সমিতির অন্য সদস্যরা রাখি খাতুনকে ভর্তি করতে রাজি হয়ে যান। ২০২২ সালের ২২ জুলাই রাখি খাতুন এই সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি ঋণ নেয়ার ইচ্ছের কথা জানালে কালিকাপুর মহিলা সমিতির সকল সদস্য তার ঋণ প্রস্তাব সুপারিশ করেন এবং তাকে ২০ হাজার টাকা এসএমএপি ঋণ প্রদান করা হয়। সেই ঋণের টাকার সঙ্গে কিছু জমানো টাকা মিলিয়ে তাদের নিজস্ব ১ বিঘা জমির সাথে ১ বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে সে তার মোট ২ বিঘা জমিতে শিম, লাউ, চালকুমড়া, মুলা, বেগুন চাষ করেন। ৬ মাসে রাখি খাতুন তার সবজি খেত থেকে সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ১,২০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন এবং অন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ৫০,০০০ টাকা। এই লাভের টাকা দিয়ে রাখি খাতুন এসএমএপি ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবং পুনরায় এসএমএপি ঋণ আবেদন করেন।

২য় দফায় রাখি খাতুনের ঋণ আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে আবার শিম চাষ প্রকল্পে ৪০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ প্রদান করা হয়। রাখি খাতুন তার সিজনের সবজি চাষের লাভের টাকা ও সিদীপ থেকে প্রাপ্ত এসএমএপি ঋণের টাকা দিয়ে আরও ২ বিঘা জমি বন্ধক নেন এবং রাখি খাতুনের স্বামী শ্রম বিক্রি বন্ধ করে দেন। রাখি খাতুনের স্বামী ও সে নিজে তাদের ৪ বিঘা জমিতে চক্রাকারে শিম, লাউ, চালকুমড়া, মুলা, বেগুন চাষ শুরু করেন যাতে করে তাদের জমি থেকে প্রতিদিন কোন না কোন সবজি বাজারে বিক্রয় করতে পারেন। এভাবে বিভিন্ন সবজি চাষ করার ফলে তাদের প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ৮০,০০০-৯০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় হয়। বিক্রয়কৃত সবজির সকল খরচ বাদ দিয়ে তাদের প্রতিমাসে প্রায় নীট ৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা লাভ হয়। বিক্রয়ের টাকা থেকে এসএমএপি ঋণ পরিশোধ করার পর তারা আরও ২ বিঘা জমি বন্ধক নেন এবং পুনরায় এসএমএপি ঋণের আবেদন করেন।

৩য় দফায় রাখি খাতুনের ঋণ আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে এবার গাভী পালন প্রকল্পে ৪০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ প্রদান করা হয়। এবার রাখি খাতুন ও তার স্বামী তাদের মোট ৬ বিঘা জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষের পাশাপাশি ১টি গাভী ক্রয় করেন। উক্ত গাভী থেকে প্রতিদিন ৫-৬ লিটার দুধ পান।

৪র্থ দফায় তিনি আবার ধান চাষ প্রকল্পে ৪০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন। এসএমএপি ঋণের প্রাপ্ত টাকা ও তাদের লাভের টাকা দিয়ে আরও ২ বিঘা জমি বন্ধক নেন এবং এই ২ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন।

এভাবে রাখি খাতুন ও তার স্বামী মো: শহিদুল ইসলাম কঠোর পরিশ্রম ও কয়েক দফা ঋণ নিয়ে বর্তমানে প্রায় ৮ বিঘা জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করছেন এবং উক্ত কৃষি খামার থেকে প্রতি সপ্তাহে সকল খরচ বাদ দিয়ে নীট প্রায় ৩০,০০০-৩৫,০০০ টাকা তাদের লাভ হয় যা মাসে প্রায় ১,২০,০০০-১,৪০,০০০ টাকা হয়। তার সাফল্যে অনেক প্রতিবেশি ঈর্ষান্বিত হয়ে নানা বিরূপ আচরণ করে থাকে। এসব প্রতিকূলতা সামলে রাখি খাতুন একাই তার কৃষি খামারকে লাভজনকভাবে পরিচালনা করছেন। বর্তমানে রাখি খাতুন তার টিনের ছোট ঘরের পরিবর্তে ইট দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছেন।

রাখি খাতুন বলেন পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। তবে তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা তৈরি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার। সাফল্য অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প কোন কিছু নেই।

দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে উন্নয়নের চাকাকে যারা সামনে ঠেলে নিয়ে চলেছেন তাদের একজন দৃঢ় ও সাবলীল রাখি খাতুনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন পথে নামলাম তখন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল, কিন্তু আমাদের সামনে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল রাখি খাতুনের দু' চোখে ফুটে ওঠা তিমির বিদারী আশার আলো।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি.), অনন্ত ব্রাঞ্চ, সিদীপ।

বই পর্যালোচনা

সমবায়ের মাধ্যমে যশপুর গ্রামের উন্নয়ন

লেখক-মো. আবদুল আলীম
সম্পাদক- ফজলুল বারী ও শিরিন হোসেন
প্রকাশকাল- জুন ২০২৫
সিদীপ-এর পক্ষে কলি প্রকাশনী

মোহাম্মদ আলী

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কর্মীদের জীবনমান উন্নয়ন, শ্রমিকদের কল্যাণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবায় ধারণা প্রচার করেছিলেন সমবায় আন্দোলনের জনক “রবার্ট ওয়েন”। অন্যদিকে ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ আমলে বাংলায় প্রথম সমবায় আন্দোলন চালু করে বাংলাদেশের সমবায়ের জনক “স্যার ডিএফ ম্যালকম”। প্রাচীনকালে বাংলার গ্রামীণ সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন- কৃষিকাজ, মাছ ধরা, গরু চড়ানো ও বন্যা মোকাবেলা ইত্যাদি। পারস্পারিক সহযোগিতা ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার আগ্রহ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এ থেকেই ব্রিটিশ আমলে আধুনিক সমবায় হিসেবে ১৯০৪ সালে যাত্রা শুরু করে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার “সমবায় ঋণ সমিতি আইন” প্রণয়ন করেন। পাকিস্তান আমলে কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ উন্নয়নে সমবায় সমিতির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান “কৃষক সমবায়”-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সমবায় শুধু কৃষিতে সীমাবদ্ধ নয়, শিল্প, সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, গৃহায়ন, দুধ উৎপাদন, মৎস শিল্প, হস্তশিল্প বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। প্রতিবছর নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবারে বাংলাদেশে “জাতীয় সমবায় দিবস” পালিত হয়।

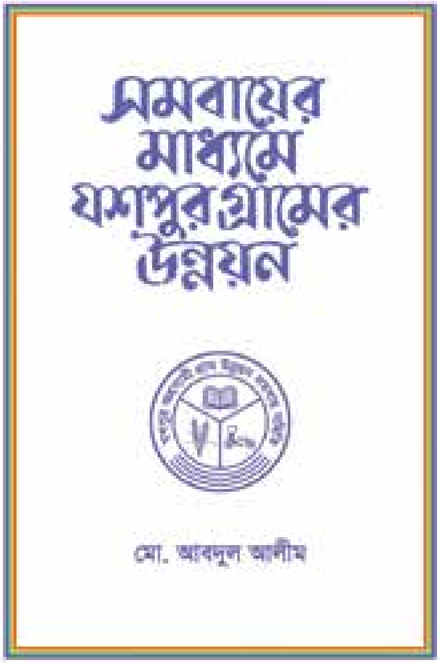

সমবায় আন্দোলনের অগ্রদূত, কুমিল্লা পদ্ধতির জনক ড. আখতার হামিদ খানের কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উক্ত বইটিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি ১৯১৪ সালের ১৪ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। উন্নত শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি ১৯৫৯ সালে প্রথম পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কুমিল্লা ও ১৯৬০-৭১ সাল পর্যন্ত কেটিসিসিএ লি. এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৩ সালে তিনি কুমিল্লা অ্যাপ্রোচ উদ্ভাবক হিসাবে “ম্যাগসাইসাই” পুরস্কার লাভ করেন। ৫টি বিষয়কে (দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়, থানা সেচ কর্মসূচি, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং পরিবার পরিকল্পনা) কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়া ও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা অ্যাপ্রোচ গৃহিত হয়। কুমিল্লা থাকাকালে তিনি অকৃত্রিম ভালোবাসা, অসীম ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কুমিল্লার দরিদ্র, ঋণে জর্জরিত মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিখ্যাত কুমিল্লা অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯৯৯ সালে ৯ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বইটিতে মোট ৩টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে লেখক তাঁর পরিচয় ও যশপুর গ্রাম উন্নয়নে ভূমিকা, ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন গ্রুপ দিয়ে শুরু, সার্বিক গ্রাম সমিতির ধারণা,

সার্বিক সমিতি গঠনের উদ্যোগ, সার্বিক সমিতি গঠন, সার্বিক সমিতি গঠনকালীন গ্রামের অবস্থা, সার্বিক সমিতিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ শুরু, যাদের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি–শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মো. আবদুল আলীম ১৯৫৬ সালের পয়লা জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অভাব অনটনের কারণে তিনি লেখাপড়া বেশি করতে পারেননি। তাঁর রোজগারের একটাই পথ ছিল কৃষি কাজ। ৭৪ এর দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন অতিবাহিত করতো। তিনি চিন্তা করলেন গ্রামের মানুষকে সাবলম্বি করতে হলে আমাদের দলবদ্ধ বা সমিতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। তারপর তিনি যশপুর গ্রামের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন গ্রুপের ১৩ জন সদস্যের কাছ থেকে ০২ টাকা করে ২৬ টাকা আমানত নিয়ে "যশপুর ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন অ্যাসোসিয়েশন" গঠন করেন। সার্বিক গ্রাম সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা ছিল, যেমন-প্রকল্পে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্রকৃষক ছাড়া অন্য কাউকে নেওয়া যায় না। পরবর্তীতে বার্ডের সহযোগিতা কামনা করে সার্বিক সমিতি গঠন করা হয়। যশপুর কৃষক সমবায় সমিতি লি., ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন অ্যাসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে এবং সকলে একমত হয়ে সার্বিক সমিতি গঠন করা হয়। তখন থেকে সমিতির নামকরণ করা হয় যশপুর অগ্রগামী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.। এ সমিতির মাধ্যমে গ্রামে গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানো, নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও বৃক্ষ-রোপণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হয়, গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নে অংশগ্রহণ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, মদ-জুয়া, সন্ত্রাস দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। এ সমিতি গঠনে এবং কাজে অনেকের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছে যারা অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যশপুর গ্রাম পরিচিতি, সমিতির স্তম্ভ ও কার্য ক্রম (ক-ঝ), সমিতির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুমিল্লা সদর উপজেলার অন্তর্গত ০১নং কালীর বাজার ইউনিয়নে যশপুর গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামটিতে ৫৭৮টি পরিবার এবং ১৪১০ একর জমি রয়েছে। আবাদি জমিতে আউশ, আমন ও বোরো এই তিন মৌসুমেই বিভিন্ন ধরনের ধানের চাষ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৩টি এবং ০৯টি মসজিদ রয়েছে। সমিতির মাধ্যমে যে ৯টি স্তম্ভ নিয়ে কাজ করে সুফল পাওয়া গেছে সেগুলো হলো: ১. সাংগঠনিক কার্যক্রম, ২. কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম, ৩. পরিবার পরিকল্পনা, ৪. নারী উন্নয়ন, ৫. শিক্ষা উন্নয়ন ৬. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন, ৭. সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ৮. বৃক্ষরোপন কার্যক্রম, ৯. গ্রামের অবকাঠামো ও সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম।

> সমবায়ের মাধ্যমে যশপুর গ্রামের উন্নয়ন বইটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ পারে বৃহৎ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে। একটি গ্রাম বা সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার বিকল্প নেই এই নির্দেশনা এখানে পাওয়া যায়

সাংগঠনিক কার্যক্রমের নিয়মানুযায়ী সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হওয়া, পুঁজি গঠন, হিসাবরক্ষণ করা, অডিট করা, সদস্যগণকে লাভ-ক্ষতি জানানো ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। সাংগঠনিক ব্যবস্থা হচ্ছে সমিতিকে টিকিয়ে রাখার ফাউন্ডেশন। ১৯৮৩ সালে সার্বিক সমিতি করার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে সমিতির সদস্যগণের আমানত বা সঞ্চয় এর ৭৩,৫০০ টাকা দিয়ে একটি গভীর নলকূপ বসানো হয়। এছাড়াও কৃষি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার কারণে কৃষি উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৬০জন কে স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিবার-পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। পরিবার-পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। নারী উন্নয়ন বা উদ্যোক্তা গঠনের লক্ষ্যে মহিলা সমিতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দুপুর ৩.৩০ ঘটিকায় যশপুর কুমার পুস্করিণীর কালা মিয়ার বাড়িতে সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, নকশীকাথায় ফুল তোলা, জাল বুনন, মুড়ি ভাজাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সাংস্কৃতিক, বৃক্ষরোপণ, গ্রামের অবকাঠামো ও সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বইটিতে সমিতির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটি সুন্দর বিবরণী প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়-এ সমিতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন, যশপুর সমিতির উপর আঘাত, সমিতির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ

বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত, ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সমিতির প্রাপ্ত পুরস্কার, সমিতির বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান, পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যখন থেকে সার্বিক সমিতি গঠন করা হয় তখন কেউ উক্ত সমিতির সদস্য না হলে কোন সেচের প্রয়োজন হলে গভীর ও অগভীর নলকূপ বসাতে পারতো না, বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষি উপকরণ এবং অন্যান্য সুবিধা পেত না। বর্তমানে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এনজিও কাজ করছে। এখন সমবায় এর প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে গেছে আবার সরকারও গুরুত্ব কম দিচ্ছে। যশপুর অগ্রগামী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির সদস্যের টাকা দিয়ে ২ শতক জায়গা ক্রয় করা হয় অফিস ঘরের জন্য কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিহিংসার কারণে অফিস ঘরের জায়গাটি সরকারি জমি হিসেবে দাবি করা হয় এবং এক পর্যায়ে অফিস ঘরটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। পরবর্তীতে সদস্যগণ তাদের পাওনা টাকা নিয়ে যাবেন মর্মে সবাই একমত হয়। এছাড়া সমিতির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে সদস্যদের শেয়ার অনুপাতিক হারে বন্টণ করে দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে সার্বিক সমিতির ৪১ জন সদস্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত থেকে সঞ্চয় জমা করেন। সমিতির বিভিন্ন খাতে মূলধন হিসাবে সর্বমোট ৩,৭৮,২০১ টাকা জমা রয়েছে। যশপুর অগ্রগামী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বর্তমানেও বার্ডের সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছে। পরিশিষ্ট-১ এর যশপুর সমিতির মৃত সদস্যদের তালিকা দেয়া হয়েছে এবং পরিশিষ্ট-২ এ শিরিন হোসেনের ফেসবুক ওয়ালে প্রাপ্ত ছবিটি নিয়ে জনাব ফজলুল বারির ফেসবুক পোস্ট ও কমেন্টসমূহ প্রদান করা হয়েছে।

সমবায়ের মাধ্যমে যশপুর গ্রামের উন্নয়ন বইটি'র মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ পারে বৃহৎ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে। একটি গ্রাম বা সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার বিকল্প নেই এই নির্দেশনা এখানে পাওয়া যায়। এই বইটির মাধ্যমে আপনি কিভাবে সঞ্চয়ী হবেন, কিভাবে গ্রামীন উনড়বয়নে ভূমিকা রাখবেন, কৃষি খাতে কিভাবে উনড়বয়ন করবেন, উদ্যোক্তা কিভাবে হবেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অবদান কিভাবে রাখবেন ইত্যাদি বিষয়ে জানা যাবে।

লেখক: উন্নয়নকর্মী (সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত)

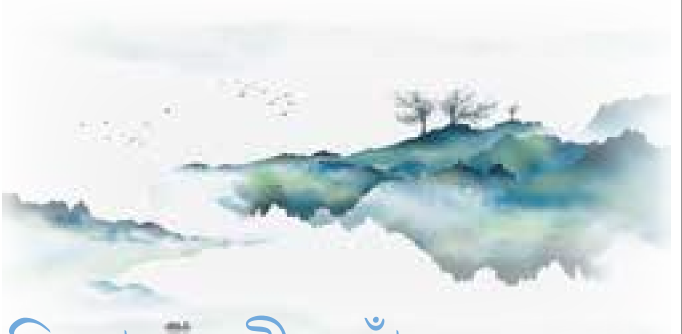

তিতাস নদীর বাঁকে

হুমায়ূন কবির

বর্ষাকালে তিতাস নদী
জলে থাকে উচ্ছলা
চাঁদের ছায়া জলে পড়ে
হয় যে আরো উজ্জ্বলা।

নদীর পাশে বাড়ি আমার
মানুষ নদীর বাঁকেতে,
রোজ সকালে ঘুম যে ভাঙ্গে
শত পাখির ডাকেতে।

শরৎ এলে নদীর তীরে
কাশ ফুল ফোটে বনেতে,
শরৎ বায়ু লাগলে গায়ে
সুখ যে আসে মনেতে।

বুনোফুলে ভরা থাকে
নদীর ঘেঁষা তীরেতে,
শীতের ভোরে শিশির দূর্বায়
হাঁটি আমি ধীরেতে।

ফুলে পাখি ভরা নদী
আমার জীবন তরীতে,
মুক্তা মানিক রতন যেনো
ভরা আমার থলিতে।

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উদ্যোগে
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা
ও দ্বিজেন শর্মার জন্মবার্ষিকী

লুতুব্দি গ্রামে
স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা কাজের একাংশ

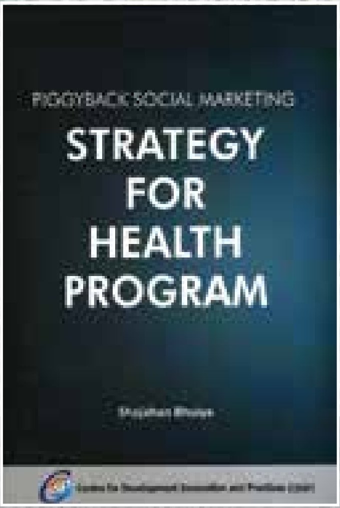

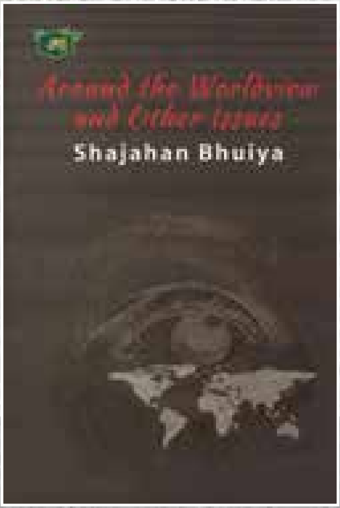

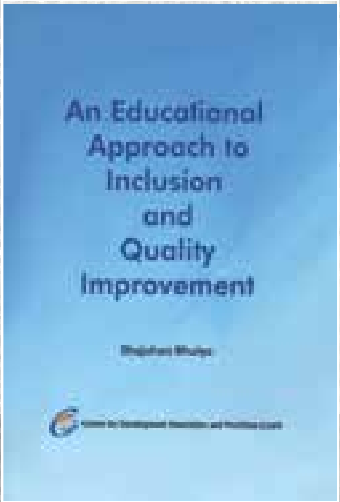

শাহজাহান ভুঁইয়ার প্রকাশিত বইসমূহ

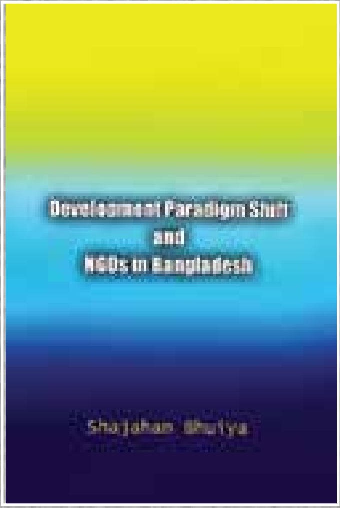

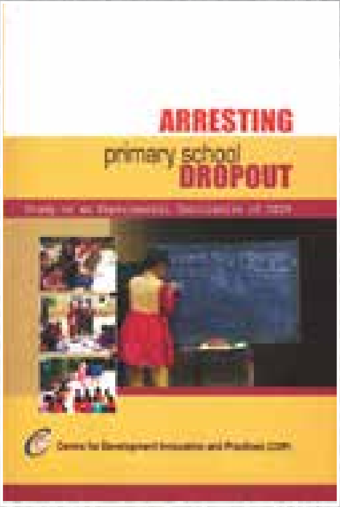

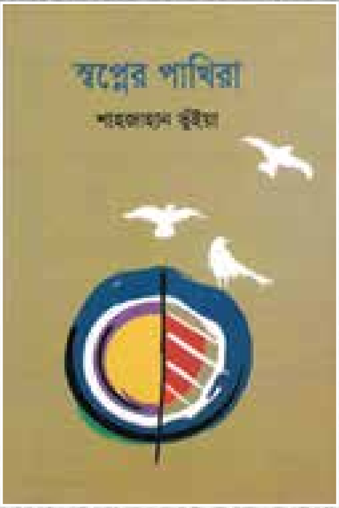

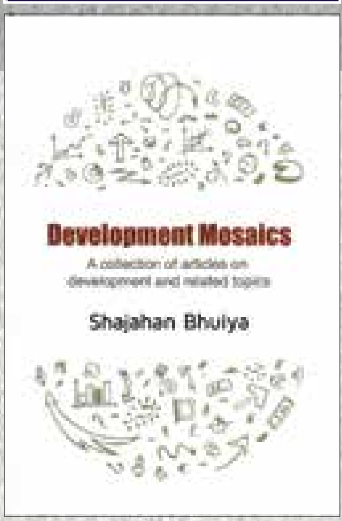

শিক্ষালোক
কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

SHIKKHALOK
(a CDIP education bulletin)
12th year 3rd issue
July - September 2025